বেণীসংহার

এক

সকালবেলা ব্যোমকেশ তার কেয়াতলার বাড়িতে চায়ের পেয়ালা এবং খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিল। শীতের সকাল, বেলা আন্দাজ আটটা। অজিত ইতিমধ্যেই তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বেরিয়ে গেছে, একজন প্রখ্যাত লেখকের বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে হবে। লেখক মহাশয় একটি নতুন বই দেবেন প্রতিশ্রুত হয়েছেন, কিন্তু প্রখ্যাত লেখকদের অনেক উমেদার, বইটা আগেভাগে হস্তগত করা দরকার।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের পাতাগুলি শেষ করে ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালা তুলে নিল। পেয়ালার অবশিষ্ট চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, সে এক চুমুকে পেয়ালা নিঃশেষ করে আবার কাগজ তুলে নিল। এবার খবর পড়তে হবে।

আজকাল খবরের কাগজ পড়লেই বোঝা যায় পৃথিবীর অবস্থা প্রকৃতিস্থ নয়। ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি তো আছেই, তা ছাড়া মানুষগুলোও যেন ক্ষেপে গেছে। যুদ্ধ বিপ্লব অন্তর্বিবাদ ধর্মঘট ঘেরাও বোমা কাঁদানে গ্যাস লাঠালাঠি। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে বলেই বোধহয় কারুর প্রাণে শান্তি নেই। যেখানে এত গাদাগাদি ঠাসাঠাসি সেখানে শান্তি কোথা থেকে আসবে?

কাগজের পাতা ওল্টাতে হলো না। প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখা গেল এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ। পরশু রাত্রে খুন হয়েছে, কাল সকালে জানাজানি হয়, আজ কাগজে বেরিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার ঘটনা, ব্যোমকেশের বাড়ি থেকে বেশি দূর নয়; সদর রাস্তায় বেরিয়ে দক্ষিণে কিছু দূর গেলেই তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়িটা চোখে পড়ে, তার কপালের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা—বেণীমাধব। ব্যোমকেশ অনেকবার বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছে কিন্তু বাড়ির অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ ছিল না। কাগজ থেকে জানা গেল বাড়ির মালিক বৃদ্ধ বেণীমাধব চক্রবর্তী এবং তাঁর দেহরক্ষীকে কেউ নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

ব্যোমকেশ নিবিষ্ট মনে হত্যার বিবরণ পড়ল, তারপর অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরাল। পরশু রাত্রে পাড়াতে এমন একটা লোমহর্ষণ খুন হয়ে গেছে, অথচ সে খবর পায়নি। রাখাল এই এলাকার দারোগা, সে নিশ্চয় তদন্তের ভার নিয়েছে; কিন্তু ব্যোমকেশকে কিছু জানায়নি। হয়তো সোজাসুজি ব্যাপার, রহস্য বা জটিলতা কিছু নেই, তাই রাখাল আসেনি। আজকাল জটিল রহস্যও বড়ই দুর্লভ হয়ে পড়েছে—

টেলিফোন বেজে উঠল। ব্যোমকেশ হাত বাড়িয়ে ফোন কানের কাছে ধরতেই ওপার থেকে আওয়াজ এল—'ব্যোমকেশদা? আমি রাখাল। আজকের কাগজ পড়েছেন?'

ব্যোমকেশ বলল,—'পড়েছি। বেণীসংহার?'

'কি বললেন—বেণীসংহার? ওঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, বেণীসংহারই বটে, তার সঙ্গে মেঘরাজ বধ।

আমি অকুস্থল থেকে কথা বলছি।'

'কি ব্যাপার ?'

'ব্যাপার একটু প্যাঁচালো ঠেকছে। কাল সকাল থেকে তদন্ত শুরু করেছি। এখনো কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কি খুব ব্যস্ত আছেন ?'

'না।'

'তাহলে একবারটি এদিকে আসবেন ? আপনার বাড়ি থেকে বেশি দূর নয়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা। বাড়ির নাম বেণীমাধব।'

'জানি।'

'কখন আসছেন ?'

'অবিলম্বে।'

দুই

বেণীমাধব চক্রবর্তী সরকারি সামরিক বিভাগে কন্ট্রাক্টরি কাজ করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন। দক্ষিণ কলকাতায় সদর রাস্তার ওপর তাঁর প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িটা সেই অর্থের যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন।

বেণীমাধব সতর্কবুদ্ধির মানুষ ছিলেন। দীর্ঘকাল ঠিকেদারি করার ফলে মনুষ্য জাতির সততায় তিনি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। কিন্তু সেজন্যে তাঁর হৃদয়ধর্ম সংকুচিত হয়নি। সংসারের এবং সেইসঙ্গে নিজের দোষত্রুটি তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করেছিলেন।

বেণীমাধবের পোষ্য বেশি ছিল না। যৌবন উত্তীর্ণ হবার পরই তিনি বিপত্নীক হয়েছিলেন ; পত্নী রেখে যান একটি পুত্র ও একটি কন্যা। তারা বড় হলে বেণীমাধব তাদের বিয়ে দিলেন। ছেলে অজয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি আস্ত অকর্মার ধাড়ি ; ব্যবসা-বাণিজ্যের চেষ্টা করে বাপের কিছু টাকা নষ্ট করে পিতৃস্কন্ধে আরোহণ করেছিল ; বেণীমাধব আর তাকে কাজে নিযুক্ত করবার চেষ্টা করেননি। তিনি বেশির ভাগ সময় বাইরে বাইরে থাকতেন, বাড়ির দ্বিতলে অজয় বাস করত তার স্ত্রী আরতি এবং পুত্রকন্যা মকরন্দ ও লাবণিকে নিয়ে। বেণীমাধব তার সংসারের খরচ দিতেন।

মেয়ের বিয়ে বেণীমাধব ভালই দিয়েছিলেন ; জামাই গঙ্গাধরের পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি ছিল। কিন্তু বড়মানুষ শ্বশুর পেয়ে তার মেজাজ চড়ে গেল, সে রেস খেলে যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিল। মেয়ে গায়ত্রী বাপের কাছে এসে কেঁদে পড়ল। বেণীমাধব মেয়ে জামাই এবং দৌহিত্রী ঝিল্লীকে নিজের বাড়িতে তুললেন ; ছেলেকে যেমন মাসহারা দিচ্ছেন মেয়ের জন্যেও তেমনি মাসহারা বরাদ্দ হলো।

বেণীমাধবের বাড়িটা তিনতলা, আগেই বলেছি। তেতলায় মাত্র তিনটি ঘর, বাকি জায়গায় বিস্তীর্ণ ছাদ। এই তেতলাটা বেণীমাধব নিজের জন্যে রেখেছিলেন, তিনি না থাকলে তেতলা তালাবন্ধ থাকত। দোতলায় আটটি ঘর, সামনে টানা বারান্দা ; এই তলায় বেণীমাধব তাঁর ছেলে অজয় ও মেয়ে গায়ত্রীকে পাশাপাশি থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাদের হাঁড়ি হেঁশেল অবশ্য আলাদা। দুই সংসারে মনের মিল ছিল না ; কিন্তু প্রকাশ্যে ঝগড়া করবার সাহসও কারুর ছিল না। ছেলেমেয়ের প্রতি বেণীমাধবের স্নেহ ছিল ; কিন্তু তিনি রাশভারী লোক ছিলেন, কড়া হতে জানতেন।

নীচের তলায় প্রকাণ্ড একটা হলঘর বিলিতি আসবাব দিয়ে ড্রয়িং-রুমের মত সাজানো ;

মাঝখানে নীচু গোল টেবিল, তাকে ঘিরে দুটো সোফা এবং গোটা কয়েক গদি-মোড়া ভারী চেয়ার, তাছাড়া আরো কয়েকটি কেঠো চেয়ার দেওয়ালের গায়ে সারি দিয়ে রাখা। কিন্তু ঘরটি বড় একটা ব্যবহার হয় না, কদাচিৎ কেউ দেখা করতে এলে অতিথিকে বসানো হয়। বাকি পাঁচখানা ঘর আগন্তুক অভ্যাগতদের জন্যে নির্দিষ্ট থাকলেও অধিকাংশ সময় তালাবন্ধ থাকত।

কিন্তু বেশি দিন তালাবন্ধ রইল না। বেণীমাধবের দুই মামাতো ছোট বোন ছিল, বহুদিন মারা গেছে; তাদের দুই ছেলে সনৎ গাঙ্গুলি ও নিখিল হালদার—পরস্পর মাসতুতো ভাই—কলকাতায় চাকরি করত; তাদের ভাল বাসা ছিল না, তাই বেণীমাধব তাদের নিজের বাড়িতে এনে রাখলেন। নীচের দু'টি ঘর নিয়ে তারা রইল।

দেখা যাচ্ছে, বেণীমাধবের ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী এবং দুই ভাগনে মিলে সাতজন পোষ্য। বাড়িতে চাকর নেই, দুটো দাসী দিনের বেলা কাজ করে দিয়ে সন্ধ্যের সময় চলে যায়।

নিতান্তই বৈচিত্র্যহীন পরিবেশ। শালা-ভগিনীপতির বয়স প্রায় সমান, তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ; কিন্তু তাদের মধ্যে মানসিক ঘনিষ্ঠতা নেই, দু'জনের আকৃতি প্রকৃতি দু'রকম। অজয় সুশ্রী ও শৌখিন গোছের মানুষ, গিলে-করা ধুতি-পাঞ্জাবি ও পালিশ করা পাম্প-শু ছাড়া সে বাড়ির বার হয় না। রোজ সকালে গড়িয়াহাটে বাজার করতে যাওয়াতে তার ঘোর আপত্তি, অধিকাংশ দিন তার স্ত্রী আরতিই বাজারে যায়। অজয় সন্ধ্যের পর ক্লাবে যায়; শখের থিয়েটারের প্রতি তার গাঢ় অনুরাগ। অভিনয় ভালই লাগে। ক্লাবটা শখের থিয়েটারেরই ক্লাব, প্রতি বছর তারা চার-পাঁচখানা নাটক অভিনয় করে।

গঙ্গাধরের চেহারাটা কাপালিক ধরনের; মুখে এবং দেহে মাংস কম, হাড় বেশি। চোখের দৃষ্টি খর। নিজের বিষয়সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে শ্বশুরের স্কন্ধে আরোহণ করার পর সে অত্যন্ত গম্ভীর এবং মিতভাষী হয়ে উঠেছে। সারা দিন বাড়ি থেকে বেরোয় না, সন্ধ্যের পর লাঠি হাতে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়। ঘন্টা দেড়েক পরে যখন ফিরে আসে তখন তার মুখ থেকে ভুর ভুর করে মদের গন্ধ বের হয়।

ননদ-ভাজের মধ্যে প্রকাশ্যত সদ্ভাব ছিল, যাওয়া-আসা গল্পগুজবও চলত; কিন্তু সুবিধে পেলে কেউ কাউকে চিমটি কাটতে ছাড়ত না। গায়ত্রী হয়তো পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে বলল—'বৌদি, আজ কি রান্নাবান্না করলে?'

আরতি রান্নার ফর্দ দিয়ে বলত—'তুমি কি রাঁধলে ভাই?'

গায়ত্রী বলল—'রান্না আর হলো কই। ভাতের ফ্যান গেলে মাংস চড়াতে গিয়ে দেখি গরম মশলা নেই! জানো তো তোমার নন্দাই শাক-ভাত খেতে পারেন না। ওঁর মাছ না হলেও চলে কিন্তু রোজ মাংস চাই। তাই খোঁজ নিতে এলুম তোমার ভাঁড়ারে গরম মশলা আছে কিনা। নইলে আবার ঝিকে বাজারে পাঠাতে হবে।'

আরতি বলল—'আছে বৈকি, এই যে দিচ্ছি।'

গরম মশলা এনে দিয়ে আরতি হাসি-হাসি মুখে বলল—'নন্দাই মাংস ভালবাসেন তাতে দোষ নেই, কিন্তু ভাই, ও জিনিসটা না খেলেই পারেন।'

গায়ত্রীর দৃষ্টি অমনি কড়া হয়ে উঠল—'কোন্ জিনিস?'

আরতি ভালমানুষের মত মুখ করে বলল—'তোমার দাদা বলছিলেন সেদিন সন্ধ্যের পর নন্দাই-এর মুখোমুখি দেখা হয়েছিল, তা নন্দাই-এর মুখ থেকে ভক্ করে মদের গন্ধ বেরুল। নন্দাই-এর বোধহয় পুরনো অভ্যেস, ছাড়তে পারেন না, কিন্তু-কথাটা যদি বাবার কানে ওঠে—'

গায়ত্রীর কঠিন দৃষ্টি কুটিল হয়ে উঠল, সে মুখে একটা বাঁকা হাসি টেনে এনে বলল—'বাবার কানে যদি কথা ওঠে তাহলে তোমরাই তুলবে বৌদি। কিন্তু সেটা কি ভাল হবে ? তোমার মেয়ের জন্য নাচের মাস্টার রেখেছ তাতে দোষ নেই কিন্তু লাবণি রাত দুপুর পর্যন্ত মাস্টারের সঙ্গে সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরে সেটা কি ভাল ? লাবণি কচি খুকি নয়, যদি একটা কেলেঙ্কারি করে বসে তাতে কি বাবা খুশি হবেন ?' গায়ত্রী আঁচল ঘুরিয়ে চলে গেল।

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

লাবণি মেয়েটি দেখতে ভাল ; ছিপছিপে লম্বা গড়ন, নাচের উপযোগী চেহারা। একটু চপল প্রকৃতি, লেখাপড়া স্কুলের সীমানা পার হবার আগেই শেষ হয়েছে ; নৃত্যকলার প্রতি তার দুরন্ত অনুরাগ। অজয় মেয়ের মনের প্রবণতা দেখে তার জন্যে নাচের মাস্টার রেখেছিল। মাস্টারটি বয়সে তরুণ, সম্পন্ন ঘরের ছেলে, নাম পরাগ লাহা ; হপ্তায় দু'দিন লাবণিকে নাচ শেখাতে আসত। বাপ-মায়ের চোখের সামনে লাবণি নাচের মহলা দিত। কদাচিৎ পরাগ বলত—'একটা নাচ-গানের বিলিতি ছবি এসেছে, দু'টো টিকিট কিনেছি রাত্রির শো'তে। লাবণিকে নিয়ে যাব ? ছবিটা দেখলে ও অনেক শিখতে পারবে।'

গোড়ার দিকে আরতি রাজী হতো না। পরাগ বলত—'থাক, আমি অন্য কোনো ছাত্রীকে নিয়ে যাব।'

ক্রমে আপত্তি শিথিল হয়ে আসে, লাবণি পরাগের সঙ্গে ছবি দেখতে যায় ; দুপুর রাত্রে পরাগ লাবণিকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

কালধর্মে সবই গা-সওয়া হয়ে যায়।

লাবণির দাদা মকরন্দ কলেজে পড়ে। কিন্তু পড়া নামমাত্র ; কলেজে নাম লেখানো আছে এই পর্যন্ত। তার মনের দিগন্ত জুড়ে আছে রাজনৈতিক দলাদলি, দলগত প্রয়োজনে যদি কলেজে যাওয়া প্রয়োজন হয় তবেই কলেজে যায়। তার চেহারা ভাল, কিন্তু মুখে চোখে একটা উগ্র ক্ষুধিত অসন্তোষ। সে বাড়িতে বেশি থাকে না ; বাড়ির সঙ্গে কেবল খাওয়া আর শোয়ার সম্পর্ক। মাঝে মাঝে আরতির সংসার-খরচের টাকা অদৃশ্য হয় ; আরতি বুঝতে পারে কে টাকা নিয়েছে, কিন্তু অশান্তির ভয়ে চুপ করে থাকে। মকরন্দ তার থিয়েটার-বিলাসী বাপকে বিদ্বেষ করে, অজয়ও ছেলের চালচলন পছন্দ করে না ; দু'জনে পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। মকরন্দ যেন তার বাপ-মায়ের সংসারে অবাঞ্ছিত অতিথি।

পাশের ফ্ল্যাটে সংসার ছোট কেবল একটি মেয়ে ঝিল্লী। ঝিল্লী লাবণির সমবয়সী, লাবণির মত সুন্দরী নয়, কিন্তু পড়াশোনায় ভাল। চাপা প্রকৃতির মেয়ে, কলেজে ভর্তি হয়েছে, নিয়মিত কলেজে যায়, লেখাপড়া করে, অবসর পেলে মাকে সংসারের কাজে সাহায্য করে। তার শান্ত মুখ দেখে মনের খবর পাওয়া যায় না।

এই গেল দোতলার মোটামুটি খবর।

নীচের তলার দু'টি ঘরে সনৎ আর নিখিল থাকে। সনতের বয়স ত্রিশের ওপর, নিখিলের ত্রিশের নীচে। চেহারার দিক থেকে দু'জনকেই সুপুরুষ বলা চলে। কিন্তু চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। সনৎ সংবৃতচিত্ত ও মিতবাক্, বিবেচনা না করে কথা বলে না। নিখিলের মুখে খৈ ফোটে, সে চটুল ও রঙ্গপ্রিয়। দু'জনেই সাংবাদিকের কাজ করে। সনৎ প্রেস-ফটোগ্রাফার। নিখিল খবরের কাগজের সংবাদ সম্পাদন বিভাগে নিম্নতর নিউজ এডিটর-এর কাজ করে। সে নিশাচর প্রাণী।—দেবতা ঘুমালে আমাদের দিন, দেবতা জাগিলে মোদের রাতি। ঋষ্যশৃঙ্গকে যারা প্রলুব্ধ করেছিল তাদেরই সমগোত্রীয়।

এরা কেউ বিয়ে করেনি। নিখিলের বিয়ে না করার কারণ, সে যা উপার্জন করে তাতে

সংসার পাতা চলে না ; কিন্তু সনতের সেরকম কোনো কারণ নেই। সে ভাল উপার্জন করে ; মাতুলগৃহে তার বাস করার কারণ অর্থাভাব নয়, ভাল বাসার অভাব। তার বিবাহে অরুচির মূল অনুসন্ধান করতে হলে তার একটি গোপনীয় অ্যালবামের শরণ নিতে হয়। অ্যালবামে অনেকগুলি কুহকিনী যুবতীর সরস ফটো আছে। ফটোগুলি দেখে সন্দেহ করা যেতে পারে যে, সনৎ অবিবাহিত হলেও ব্রহ্মচারী নয়। কিন্তু সে অত্যন্ত সাবধানী লোক। সে যদি বিবাহের বদলে মধুকরবৃত্তি অবলম্বন করে থাকে, তাহলে তা সকলের অজান্তে।

এই সাতটি মানুষ বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা। বেণীমাধব ন'মাসে ছ'মাসে আসেন, দু'দিন থেকে আবার দিল্লী চলে যান। দিল্লীই তাঁর কর্মক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দু।

হঠাৎ সাতষট্টি বছর বয়সে বেণীমাধবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হলো। তাঁর শরীর বেশ ভালই ছিল। অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর প্রিয় ভৃত্য এবং দীর্ঘদিনের অনুচর রামভজনের মৃত্যুর পর তিনি আর বেশি দিন খাড়া থাকতে পারলেন না। তিন মাসের মধ্যে তিনি ব্যবসা গুটিয়ে ফেললেন। তাঁর টাকার দরকার ছিল না, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কাজের ঝোঁকেই কাজ করে যাচ্ছিলেন। এখন দিল্লীর অফিস তুলে দিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। সঙ্গে এল নতুন চাকর মেঘরাজ।

রামভজনের মৃত্যুর পর বেণীমাধব মেঘরাজকে খাস চাকর রেখেছিলেন। মেঘরাজ ভারতীয় সেনাদলের একজন সিপাহী ছিল ; চীন-ভারত যুদ্ধে আহত হয়ে তার একটা পা হাঁটু পর্যন্ত কাটা যায়। ভারতীয় সেনাবিভাগের পক্ষ থেকে তাকে কৃত্রিম পা দেওয়া হয়েছিল এবং সামান্য পেনসন দিয়ে বিদায় করা হয়েছিল। সে বেণীমাধবের দিল্লীর অফিসে দরোয়ানের কাজ পেয়ে গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা করেছিল ; রামভজনের মৃত্যুর পর বেণীমাধব তাকে খাস চাকরের কাজ দিলেন। মেঘরাজ অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং কড়া প্রকৃতির মানুষ ; সে বেণীমাধবের একক সংসারের সমস্ত কাজ নিজের হাতে তুলে নিল ; তাঁর দাড়ি কামানো থেকে জুতো বুরুশ পর্যন্ত সব কাজ করে। তার বয়স আন্দাজ চল্লিশ ; বলিষ্ঠ চেহারা। কৃত্রিম পায়ের জন্য একটু খুঁড়িয়ে চলে।

যাহোক, বেণীমাধব এসে কলকাতার বাড়িতে অধিষ্ঠিত হলেন। তেতলার অংশে নিত্য ব্যবহারের সব ব্যবস্থাই ছিল, কেবল ফ্রিজ আর টেলিফোন ছিল না। দু'চার দিনের মধ্যে ফ্রিজ এবং টেলিফোনের সংযোগ স্থাপিত হলো। ইতিমধ্যে মেয়ে গায়ত্রী এসে আবদার ধরেছিল—'বাবা, এবার আমি তোমার খাবার ব্যবস্থা করব। আগে তুমি যখনই আসতে দাদার কাছে খেতে। আমরা কি কেউ নই ?'

বেণীমাধব বলেছিলেন,—'আমি তো একলা নই, মেঘরাজ আছে।'

'মেঘরাজ বুঝি নতুন চাকরের নাম ? আহা, বুড়ো রামভজন মরে গেল। তা মেঘরাজকেও আমি খাওয়াব।'

বেণীমাধব বিবেচনা করে বললেন—'বেশ, কিন্তু তাতে তোমার খরচ বাড়বে। আমি তোমার মাসিক বরাদ্দ আরো দেড়শো টাকা বাড়িয়ে দিলাম।'

গায়ত্রী হেসে বলল—'সে তোমার যেমন ইচ্ছে।' তার বোধহয় মনে মনে এই মতলবই ছিল ; সে মাসে সাড়ে সাতশো টাকা পেত, এখন ন'শো টাকায় দাঁড়াল।

কলকাতায় এসেই বেণীমাধব তার পুরনো বন্ধু ডাক্তার অবিনাশ সেনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ডাক্তার অবিনাশ সেন নামকরা ডাক্তার, বয়সে বেণীমাধবের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। তিনি একদিন বেণীমাধবকে নিজের ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন ; এক্স-রে, ই সি জি প্রভৃতি যান্ত্রিক পরীক্ষা হলো। তারপর ডাক্তার সেন

বললেন—'দেখুন, আপনার শরীরে সিরিয়াস কোনো ব্যাধি নেই, যা হয়েছে তা হলো বার্ধক্যের স্বাভাবিক সর্বাঙ্গীন অবক্ষয়। আমি আপনাকে ওষুধ-বিষুধ কিছু দেব না, কেবল শরীরের গ্রন্থিগুলোকে তাজা রাখবার জন্যে মাসে একটা করে ইনজেকশন দেব। আসলে আপনি বয়সের তুলনায় বড় বেশি পরিশ্রম করেছিলেন। এখন থেকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম ; বই পড়ুন, রেডিও শুনুন, রোজ বিকেলে একটু বেড়ান। এখনো অনেক দিন বাঁচবেন।'

বেণীমাধব ইনজেকশন নিয়ে সানন্দে বাড়ি ফিরে এলেন।

তারপর দিন কাটতে লাগল। গায়ত্রী নিজের হাতে থালা সাজিয়ে এনে বাপকে খাইয়ে যায়। অন্য সকলে আসা-যাওয়া করে। মকরন্দ বড় একটা আসে না, এলেও দু' মিনিট থেকে চলে যায়। নাতনীরা থাকে, বেণীমাধবের সঙ্গে গল্প করে। ঝিল্লী পড়াশুনায় ভালো জেনে বৃদ্ধ সুখী হন ; লাবণি নাচ শিখছে শুনেও তিনি অপ্রীত হন না। তিনি বয়সে প্রবীণ হলেও প্রাচীনপন্থী নন। সব মেয়েই যখন নাচছে তখন তাঁর নাতনী নাচবে না কেন ?

দিন কুড়ি-পঁচিশ কাটবার পর হঠাৎ একদিন বেণীমাধবের শরীর খারাপ হলো ; উদরাময়, পেটের যন্ত্রণা। ডাক্তার সেন এলেন, পরীক্ষা করে বললেন—'খাওয়ার অত্যাচার হয়েছে, খাওয়া সম্বন্ধে ধরা-বাঁধার মধ্যে থাকতে হবে।'

বাড়ির সকলেই উপস্থিত ছিল। গায়ত্রী শুকনো মুখে বলল—'কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমি তো বাবাকে এমন কিছু খেতে দিইনি যাতে ওঁর শরীর খারাপ হতে পারে।'

ডাক্তার কোনো কথা বললেন না, ওষুধের প্রেসক্রিপশন ও পথ্যের নির্দেশ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—'কেমন থাকেন আমি টেলিফোন করে খবর নেব।'

ডাক্তার চলে যাবার পর বেণীমাধব আরতির পানে চেয়ে বললেন—'বৌমা, আমার পথ্য তৈরি করার ভার তোমার ওপর রইল।'

আরতি বিজয়োল্লাস চেপে বলল—'হ্যাঁ বাবা।'

তিন চার দিনের মধ্যে বেণীমাধব সেরে উঠলেন, তাঁর পেট ধাতস্থ হলো। পথ্য ছেড়ে তিনি স্বাভাবিক খাদ্য খেতে লাগলেন। আরতিই তাঁর জন্যে রান্না করে চলল।

কিন্তু বেণীমাধবের মন শান্ত নয়। চিরদিন নানা লোকের সঙ্গে নানা কাজে দিন কাটিয়েছেন, এখন তাঁর জীবন বৈচিত্র্যহীন। সকালে মেঘরাজ তাঁর দাড়ি কামিয়ে দেয়, তিনি স্নানাদি করে চা খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসেন। তাতে ঘন্টাখানেক কাটে। তারপর রেডিও চালিয়ে খানিকক্ষণ গান শোনেন। গান বেশিক্ষণ ভাল লাগে না, রেডিও বন্ধ করে বই এবং সাময়িক পত্রিকার পাতা ওলটান।

একদিন কলকাতার পুরনো বন্ধুদের কথা মনে পড়ে যায়। টেলিফোন ডিরেক্টরি খুঁজে তাঁদের নাম বার করেন, টেলিফোন করে কাউকে পান না কাউকে পান ; কিছুক্ষণ পুরনো কালের গল্প হয়। এগারোটার পর আরতি ভাতের থালা নিয়ে আসে। আহারের পর তিনি ঘন্টাখানেক বিছানায় শুয়ে দিবানিদ্রায় কাটান।

বিকেলবেলা ঝিল্লী কিংবা লাবণি আসে, তাদের সঙ্গে খানিক গল্প করেন। লাবণিকে বলেন—'কেমন নাচতে শিখেছিস দেখা।'

লাবণি বলে—'আমি এখনো ভাল শিখিনি দাদু, ভাল শিখলে তোমাকে দেখাব।'

বেণীমাধব বলেন—'তোর মাস্টার ভাল শেখাতে পারে ?'

লাবণি গদ্‌গদ হয়ে বলে—'খু-ব ভাল শেখাতে পারেন। এত ভাল যে—' লজ্জা পেয়ে সে অর্ধপথে থেমে যায়।

বেণীমাধব প্রশ্ন করলেন—'কত বয়স মাস্টারের ?'

'তা কি জানি ! হবে ছাব্বিশ সাতাশ। যাই, মা ডাকছে।' লাবণি তাড়াতাড়ি চলে যায়।

সূর্যাস্তের পর বেণীমাধব খোলা ছাদে অনেকক্ষণ পায়চারি করেন। ইচ্ছে হয় রবীন্দ্র সরোবরে গিয়ে লোকজনের মধ্যে খানিক বেড়িয়ে আসেন ; কিন্তু তিনতলা সিঁড়ি ভাঙা তাঁর পক্ষে কষ্টকর, তাই ছাদে বেড়িয়েই তাঁর ব্যায়াম সম্পন্ন হয়।

রাত্রি ন'টার সময় আহার সমাপন করে তিনি শয়ন করেন। এই তাঁর দিনচর্যা। মেঘরাজ হামেহাল তাঁর কাছে হাজির থাকে ; কখনো ঘরের মধ্যে কখনো দোরের বাইরে। তিনি শয়ন করলে মেঘরাজ নীচে গিয়ে আহার সেরে আসে ; বেণীমাধবের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার বাইরে আগড় হয়ে বিছানা পেতে শোয়।

এইভাবে দিন কাটছে। একদিন এক অধ্যাপক বন্ধুকে টেলিফোন করে বেণীমাধবের মুখ গম্ভীর হলো। টেলিফোন রেখে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর মেঘরাজকে ডেকে বললেন—'তুমি নীচে গিয়ে মকরন্দকে ডেকে আনো।'

কয়েক মিনিট পরে মকরন্দ এসে দাঁড়াল। চাকরের মুখে তলব পেয়ে সে খুশি হয়নি, অপ্রসন্ন মুখে প্রশ্ন নিয়ে পিতামহের মুখের পানে চাইল। বেণীমাধব কিছুক্ষণ তার উল্কখুল্ক চেহারার পানে তাকিয়ে রইলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি কলেজে ঢুকেছ, লেখাপড়া কেমন হচ্ছে ?'

মকরন্দর মুখ ভ্রূকুটি-গভীর হলো—'হচ্ছে এক রকম।'

বেণীমাধব বললেন—'শুনলাম তুমি ক্লাসে যাও না, দল পাকিয়ে পলিটিক্স করে বেড়াও, এ কথা সত্যি ?'

উদ্ধত স্বরে মকরন্দ বলল—'কে বলেছে ?'

বেণীমাধব কড়া সুরে বললেন—'কে বলেছে সে কথায় তোমার দরকার নেই। কথাটা সত্যি কিনা ?'

'হ্যাঁ সত্যি।' মকরন্দ চোখ লাল করে ঠাকুরদার পানে চেয়ে রইল।

'বটে !' বেণীমাধবের চোখেও রাগের ফুলকি ছিটকে পড়ল—'তুমি বেয়াদবি করতে শিখেছ। —মেঘরাজ !'

মেঘরাজ দোরের বাইরে ছিল, ঘরে ঢুকল। বেণীমাধব আঙুল দেখিয়ে বললেন—'এই ছোঁড়ার কান ধরে গালে একটা থাবড়া মারো, তারপর ঘাড় ধরে বার করে দাও।'

মেঘরাজ সিপাহী ছিল, সে হুকুমের চাকর। যথারীতি মকরন্দর কান ধরে গালে চড় মারল। মকরন্দর মনে যতই ধৃষ্টতা থাক, মেঘরাজের সঙ্গে হাতাহাতি করবার সাহস বা দৈহিক শক্তি তার নেই, সে ধাক্কা খেতে খেতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কথাটা আর চাপা রইল না। অজয় আর আরতি ছুটে এসে বেণীমাধবের কাছে ক্ষমা চাইল। বেণীমাধব গম্ভীর হয়ে রইলেন, শেষে বললেন—'বংশে একটা মাত্র ছেলে, সে বেল্লিক বেয়াদব হয়ে উঠেছে। দোষ তোমাদের, তোমারা ছেলে শাসন করতে জানো না।'

ব্যাপারটা আর বেশিদূর গড়াল না।

তারপর একদিন বিকেলবেলা সনৎ এল মামার সঙ্গে দেখা করতে। সনৎ আর নিখিল মাঝে মাঝে এসে মামার কাছে বসে, সসম্ভ্রমে মামার কুশল প্রশ্ন করে চলে যায়। আজ সনৎ তার ক্যামেরা নিয়ে এসেছে, বলল—'মামা, আপনার একটা ছবি তুলব।'

বেণীমাধব হেসে বললেন—'আমি বুড়ো মানুষ, আমার ছবি তুলে কি হবে !'

সনৎ বলল—'আমার অ্যালবামে রাখব।'

'কিন্তু এখন আলো কমে গেছে, এ আলোতে ছবি তোলা যাবে ?'

'যাবে। আমি ফ্ল্যাশ বাল্‌ব এনেছি।'

'বেশ, তোলো।' বেণীমাধব একটি হেলান দেওয়া চেয়ারে বসলেন।

সনৎ ছবি তোলার উপক্রম করছে এমন সময় নিখিল এসে দাঁড়াল। সনৎ এদিক ওদিক ঘুরে শেষে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ছবি তুলল ; বাল্‌বটা একবার জ্বলে উঠেই নিভে গেল। নিখিল বলল—'সনৎদা, ছবি তৈরি হলে আমাকে একখানা দিও, আমি কাগজে ছাপব। মামা কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন, কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে আছেন, খবরটা প্রকাশ করা দরকার।'

বেণীমাধব মনে মনে ভাগনেদের ওপর খুশি হলেন।

পরদিন সনৎ ছবি এনে বেণীমাধবকে দেখাল। ছবিটি ভাল হয়েছে ; বেণীমাধবের জরাক্রান্ত মুখ শিল্পীর নৈপুণ্যে শান্ত কোমল ভাব ধারণ করেছে। সনৎ যে কৌশলী শিল্পী তাতে সন্দেহ নেই।

বেণীমাধব বললেন—'বেশ হয়েছে। এটাকে বাঁধিয়ে কোথাও টাঙিয়ে রাখলেই হবে।'

সনৎ বলল—'আমি এন্‌লার্জ করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে এনে দেব। নিখিলকে এক কপি দিয়েছি, সে কাগজে ছাপবে।'

অতঃপর বেণীমাধবের কর্মহীন মন্থর দিনগুলি কাটছে। সনৎ বড় ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে গেছে। কাগজে তাঁর ছবি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় বেরিয়েছে। এরকম অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে মানুষ শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা লাভ করে। কিন্তু বেণীমাধবের মনে শান্তি স্বচ্ছন্দতা আসছে না। ছেলে ও মেয়ের পরিবারের সঙ্গে একটানা সান্নিধ্য তিনি উপভোগ করতে পারছেন না। পারিবারিক জীবনের স্বাদ ভুলে গিয়ে যাঁরা দীর্ঘকাল একলা পথে চলেছে তাঁদের বোধহয় এমনিই হয়।

ওদিকে ছেলে এবং মেয়ের পরিবারেও সুখ নেই। গায়ত্রীর মেজাজ সর্বদাই তিরিক্ষি হয়ে থাকে। গঙ্গাধর সারা দিন বসে একা একা তাস খেলে, সলিটেয়ার খেলা ; সন্ধ্যের সময় চুপি চুপি বেরিয়ে যায়, আবার বেশি রাত্রি হবার আগেই ফিরে আসে। অজয় ক্লাবে গিয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আড্ডা জমাত কিংবা রিহার্সেল দিত ; এটা ছিল তার জীবনের প্রধান বিলাস। এখন তাকে রাত্রি ন'টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হয়, কারণ কর্তার হুকুম—ন'টার পর সদর দরজা খোলা থাকবে না। ন'টার পর বাড়ি ফিরে দোর ঠেলাঠেলি করলে তেতলায় শব্দ যাবে, সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। সকলেরই একটা চোখ এবং একটা কান তেতলার দিকে সতর্ক হয়ে থাকে। আরতি যদিও সর্বদাই শ্বশুরকে খুশি করবার চেষ্টা করছে, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

নিশ্চিন্ত আছে কেবল দোতলায় দু'টি মেয়ে, লাবণি আর ঝিল্লী, এবং নীচের তলায় সনৎ ও নিখিল। ঝিল্লী আর লাবণির বয়স মাত্র আঠারো, বিষয়বুদ্ধি এখানো পরিপক্ক হয়নি। সনৎ আর নিখিলের বেলায় পরিস্থিতি অন্যরকম ; মামা তাদের বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তারা মামার কাছে অর্থ-প্রত্যাশী নয়। সনতের গোপন নৈশাভিসারের কথা বেণীমাধব জানতে পারবেন এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। নিখিলের ওসব দোষ নেই, উপরন্তু কয়েক মাস থেকে সে এক নতুন ব্যাপারে মশগুল হয়ে আছে।

বেণীমাধব কলকাতায় এসে বসবার আগে একদিন নিখিল হঠাৎ ডাকে একটা চিঠি পেল, খামের চিঠি। তাকে চিঠি লেখবার লোক কেউ নেই, সে একটু আশ্চর্য হয়ে চিঠি খুলল। এক পাতা কাগজের ওর দু'ছত্র লেখা আছে—

আমি একটি মেয়ে। তোমাকে ভালবাসি।—

চিঠির নীচে লেখিকার নাম নেই।

নিখিল কিছুক্ষণ বোকার মত চেয়ে রইল। তারপর তার মুখে গদ্‌গদ হাসি ফুটে উঠল। একটা মেয়ে তাকে ভালবাসে! বা রে! ভারি মজা তো!

কিন্তু কে মেয়েটা?

নিখিল খামের ওপর পোস্ট অফিসের সীলমোহর পরীক্ষা করল; সীলমোহরের ছাপ জেবড়ে গেছে, তবু কলকাতায় চিঠি ডাকে দেওয়া হয়েছে এটুকু বোঝা যায়। কলকাতার মেয়ে। কে হতে পারে? চিঠিই বা লিখল কেন? ভালবাসা জানাবার আরো তো অনেক সোজা উপায় আছে। মুখে বলতে লজ্জা হয়েছে তাই চিঠি। কিন্তু নিজের নাম লেখেনি কেন?

নিখিল অনেক মেয়েকে চেনে। তার অফিসেই তো গোটা দশেক আইবুড়ো মেয়ে কাজ করে। তাছাড়া বন্ধুবান্ধবের বোনেরা আছে। মেয়েরা তার চটুল রঙ্গপ্রিয় স্বভাবের জন্যে তার প্রতি অনুরক্ত, তাকে দেখলেই তাদের মুখে হাসি ফোটে। কিন্তু কেউ তাকে চুপিচুপি ভালবাসে বলেও তো মনে হয় না। আর এত লজ্জাবতীও কেউ নয়।

হাতে চিঠি নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিখিল এইসব ভাবছে এমন সময় পিছন দিক থেকে লাবণির গলা শুনতে পেল—'কি নিখিল কাকা, কার চিঠি পড়ছ?'

নিখিল ফিরে দাঁড়াল। ঝিল্লী আর লাবণি কখন দোতলা থেকে নেমে এসেছে; তাদের হাতে কয়েকখানা বই। তারা একসঙ্গে লাইব্রেরিতে যায় বই বদল করতে।

নিখিল হাত উঁচুতে তুলে নাড়তে নাড়তে বলল—'কার চিঠি! একটি যুবতী আমাকে চিঠি লিখেছে।' বলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

লাবণি বলল—'যুবতী লিখেছে! কী লিখেছে!'

নিখিল বলল—'হুঁ হুঁ, দারুণ ব্যাপার, গুরুতর ব্যাপার। লিখেছে সে আমাকে ভালবাসে।'

লাবণি আর ঝিল্লী অবাক হয়ে পরস্পরের পানে তাকাল, তারপর হেসে উঠল। লাবণি বলল—'কেন গুল মারছ নিখিল কাকা। তোমাকে আবার কোন্ যুবতী ভালবাসবে?'

নিখিল চোখ পাকিয়ে বলল—'কেন, আমাকে কোনো যুবতী ভালবাসতে পারে না। দেখেছিস আমার চেহারাখানা।'

'দেখেছি। এখন বলো কার চিঠি।'

'বললাম না যুবতীর চিঠি!'

ঝিল্লী প্রশ্ন করল—'যুবতীর নাম কি?'

নিখিল মাথা চুলকে বলল—'নাম! জানি না। চিঠিতে নাম নেই।'

ঝিল্লী আর লাবণি আবার হেসে উঠল। লাবণি বলল—'তোমার একটা কথাও আমরা বিশ্বাস করি না। নিশ্চয় পাওনাদারের চিঠি।'

'পাওনাদারের চিঠি! তবে এই দ্যাখ।' নিখিল চিঠিখানা তাদের নাকের সামনে ধরল।

দু'জনে চিঠি পড়ল। লাবণি বলল—'হুঁ। কিন্তু চিঠি পড়েও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, একটা মেয়ে তোমাকে প্রেম নিবেদন করেছে। আমার মনে হয় কেউ তোমার ঠ্যাং ধরে টেনেছে, মানে লেগ-পুলিং।'

নিখিল একটু গরম হয়ে বলল—'যা যা, তোরা এসব কী বুঝবি! এসব গভীর ব্যাপার। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, শুনেছিস কখনো?'

'শুনেছি।' ঝিল্লী আর লাবণি মুখ টিপে হাসতে হাসতে চলে গেল।

এর পর থেকে যখনি কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় নিখিল উৎসুক চোখে তার পানে তাকায় কিন্তু কোনো সাড়া পায় না। তার মন আরো ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কে মেয়েটা? নিশ্চয়

তার পরিচিত। তবে এমন লুকোচুরি খেলছে কেন ?

মাসখানেক পরে দ্বিতীয় চিঠি এল। এবার একটু বড়—

আমি একটি মেয়ে। তোমাকে ভালবাসি। আমাকে চিনতে পারলে না ?

চিঠি পেয়ে নিখিলের মন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। লাবণি আর ঝিল্লী হাতের কাছে নেই, কিন্তু কাউকে না বলেও থাকা যায় না, তাই সে ঝোঁকের মাথায় সনতের ঘরে গেল।

সনতের ঘরটি বেশ বড় ; এই একটি ঘরের মধ্যে তার একক জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঞ্চিত আছে। এক পাশে খাটের ওপর পুরু গদির বিছানা পাতা ; খাটের শিথানের কাঠের ওপর বিচিত্র জাফরির কারুকার্য। ঘরের অন্য পাশে জানালার সামনে দেরাজযুক্ত টেবিল, তার ওপর ফটোগ্রাফির নানা সরঞ্জাম সাজানো ; তিনটি হাতে-তোলা ক্যামেরা, তার মধ্যে একটি সিনে-ক্যামেরা। ঘরে একটি আয়নার কবাটযুক্ত আলমারিও আছে। ঘরটি ছিমছাম ফিটফাট, দেখে বোঝা যায় সনৎ গোছালো এবং শৌখিন মানুষ।

নিখিল যখন ঘরে ঢুকল তখন সনৎ টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে একটা ক্যামেরার যন্ত্রপাতি খুলে পরীক্ষা করছিল, চোখ তুলে চেয়ে আবার কাজে মন দিল। নিখিল গম্ভীর মুখে বলল—'সনৎদা, গুরুতর ব্যাপার।'

সনৎ একবার চকিতে চোখ তুলল, বলল—'তোমার জীবনে গুরুতর ব্যাপার কী ঘটতে পারে ! আমাশা হয়েছে ?'

নিখিল বলল—'আমাশা নয়, একটা মেয়ে আমার প্রেমে পড়েছে।'

এবার সনৎ বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। শেষে বলল—'আমাশা নয়, দেখছি তোমার মাথার ব্যারাম হয়েছে। বাংলা দেশে এমন মেয়ে নেই যে তোমার প্রেমে পড়বে।'

নিখিল বলল—'বিশ্বাস হচ্ছে না ? এই দেখ চিঠি। মাসখানেক আগে আর একটা পেয়েছি।'

চিঠি নিয়ে সনৎ একবার চোখ বুলিয়ে ফেরত দিল, প্রশ্ন করল—'মেয়েটাকে চেনো না ?'

'না, সেই তো হয়েছে মুশকিল।'

সনৎ একটু চুপ করে রইল, তারপর বলল—'বুঝেছি। তোমার চেনা-শোনার মধ্যে কোনো কালো কুচ্ছিত মেয়ে আছে ?'

নিখিল হেসে বলল—'বেশির ভাগই কালো কুচ্ছিত সনৎদা।'

সনৎ বলল—'তাহলে ওই কালো কুচ্ছিত মেয়েদের মধ্যেই একজন বেনামী চিঠি লিখে রহস্য সৃষ্টি করছে। তোমাকে তাতাবার চেষ্টা করছে। তোমার ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে ওদের এড়িয়ে চলবে।'

কিন্তু এড়িয়ে চলার ক্ষমতা নিখিলের নেই। তাছাড়া কালো কুচ্ছিত মেয়ের প্রতি তার বিরাগ নেই। তার বিশ্বাস কালো কুচ্ছিত মেয়েরা ভালো বৌ হয়। সে চতুর্গুণ আগ্রহে অনামা প্রেমিকাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

তারপর বেণীমাধব এলেন, বাড়ির আবহাওয়া বদলে গেল। কিন্তু নিখিলের কাছে নিয়মিত চিঠি আসতে লাগল। তৃতীয় চিঠিতে লেখা হয়েছে—

আমি তোমাকে ভালবাসি। আমাকে চিনতে পারলে না ? আমি কিন্তু সুন্দর মেয়ে নই।

নিখিল ভাবল, সনৎদা ঠিক ধরেছে। কিন্তু সে দমল না। তার জীবনে এক অভাবিত রোমান্স এসেছে ; একে তুচ্ছ করার সাধ্য তার নেই।

ওদিকে বেণীমাধব হপ্তা তিনেক পুত্রবধূর হাতের রান্না খেয়ে বেশ ভালই রইলেন। তারপর একদা গভীর রাত্রে ওঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল ; পেটে দারুণ যন্ত্রণা। যাতনায় ছটফট করতে করতে

মেঘরাজকে ডাকলেন। বেণীমাধব দু'হাতে পেট চেপে ধরে বসেছিলেন, বললেন—'মেঘরাজ, শীগ্‌গির ডাক্তার সেনকে ফোন করো, বলো আমি পেটের যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি, এখনি যেন আসেন।'

মেঘরাজ ফোন করল, আধ ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার সেন এলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। পেটের প্রদাহ কিন্তু সহজে উপশম হলো না ; রাত্রি পাঁচটা পর্যন্ত ধস্তাধস্তির পর ব্যথা শান্ত হলো। বেণীমাধব নির্জীব দেহে বিছানায় শুয়ে বিস্ফারিত চোখে ডাক্তারের পানে চাইলেন—'ডাক্তার, কেন এমন হলো বলতে পার ?'

ডাক্তার গম্ভীর মুখে ক্ষণেক চুপ মেরে রইলেন, তারপর অনিচ্ছাভরে বললেন—'নিঃসংশয়ে বলা শক্ত। অ্যালারজি হতে পারে, শূল ব্যথা হতে পারে, কিংবা—'

'কিংবা— ?'

'কিংবা বিষের ক্রিয়া।—আমি বলি কি, আপনি কিছুদিন আমার নার্সিং হোমে থাকবেন চলুন। চিকিৎসা পথ্য দুইই হবে।'

বেণীমাধবের কিন্তু নার্সিং হোমে বিশ্বাস নেই ; তাঁর ধারণা যারা একবার নার্সিং হোমে ঢুকেছে তারা আর ফিরে আসে না। তিনি যথাসম্ভব দৃঢ়স্বরে বললেন—'না ডাক্তার, আমি বাড়িতেই থাকব।'

ডাক্তার উঠলেন—'আচ্ছা, এখন চলি। যদি আবার কোনো গণ্ডগোল হয় তৎক্ষণাৎ খবর দেবেন। কাল আর পরশু স্রেফ দই খেয়ে থাকবেন।'

মেঘরাজ ডাক্তারের সঙ্গে নীচে পর্যন্ত গিয়ে সদর দরজা খুলে দিল, ডাক্তার চলে গেলেন। মেঘরাজ দরজা বন্ধ করে আবার ওপরে উঠে এল। বাড়ির অন্য মানুষগুলো তখনো ঘুমোচ্ছে, ডাক্তারের আসা-যাওয়া জানতে পারল না।

বিছানায় শুয়ে বেণীমাধব তখন শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে চিন্তা করছিলেন। দুরূহ দুর্গম চিন্তা। পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতি। একবার নয়, দু'-দু'বার এই ব্যাপার হলো....ছেলে আর মেয়ে অপেক্ষা করে আছে আমি কবে মরব....আমি মরছি না দেখে অধীর হয়ে উঠেছে ! কিন্তু ছেলে মেয়ে জামাই পুত্রবধূ এমন কাজ করতে পারে ? কেন করবে না, সংসারে টাকাই খাঁটি জিনিস, আর যা-কিছু সব ভুয়ো। ডাক্তারের মনেও সন্দেহ ঢুকেছে...

সকাল সাতটার সময় বেণীমাধব বিছানায় উঠে বসলেন, মেঘরাজ তাঁর দাড়ি কামিয়ে দিল। তারপর তিনি তার হাতে টাকা দিয়ে বললেন—'যাও, বাজার থেকে দই কিনে নিয়ে এসো। এক সের ভাল দই।'

টাকা নিয়ে মেঘরাজ চলে গেল। সে সৈনিক, হুকুম তামিল করে, কথা বলে না। তার মুখ দেখেও কিছু বোঝা যায় না।

সাড়ে সাতটার সময় আরতি এল, তার সঙ্গে ঝি ট্রে'র ওপর চা ও প্রাতরাশ নিয়ে এসেছে। ঘরে ঢুকেই আরতি চমকে উঠল ; বেণীমাধব বিছানায় বসে একদৃষ্টে তার পানে চেয়ে আছেন। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—'বাবা—'

বেণীমাধব ধীর স্বরে বললেন—'বৌমা, খাবার ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আজ থেকে আমার খাবার ব্যবস্থা আমি নিজেই করব।'

আরতির মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল—'কেন বাবা ?'

বেণীমাধব গত রাত্রির ঘটনা বললেন। আরতি শুনে মুখ কালি করে চলে গেল।

কথাটা ঝিয়ের মুখে অচিরাৎ প্রচারিত হলো। শুনে গায়ত্রী ছুটতে ছুটতে বাপের কাছে এল—'বাবা, বৌদির রান্না তোমার সহ্য হবে না আমি জানতুম। আজ থেকে আমি আবার

রাঁধব।'

বেণীমাধব মেয়েকে আপাদমস্তক দেখে কড়া সুরে বললেন—'না—'

বেলা তিনটের সময় তিনি কর্তব্য স্থির করে বিছানায় উঠে বসে ডাকলেন—'মেঘরাজ!'

মেঘরাজ এসে দাঁড়াল—'জি।'

বেণীমাধব প্রশ্ন করলেন—'তোমার বৌ আছে?'

মেঘরাজ ভ্রূ তুলে খানিক চেয়ে রইল, যেন প্রশ্নের তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা করছে—'জি, আছে।'

'ছেলেপুলে?'

'জি, না।'

'স্ত্রী নিশ্চয় রসুই করতে জানে?'

'জি, জানে।'

'বেশ। এখন আমার প্রস্তাব শোনো। তুমি দেশে গিয়ে তোমার ঔরৎকে নিয়ে এসো। নীচের তলায় খালি ঘর আছে, তার একটাতে তোমরা থাকবে। তোমার ঔরৎ আমার রসুই করবে। আমি তোমার মাইনে ডবল্ করে দিলাম। তুমি কাল সকালে প্লেনে দিল্লী চলে যাও, বৌকে নিয়ে যত শীগ্‌গির পার ফিরে আসবে; প্লেনের ভাড়া ইত্যাদি সব খরচ আমি দেবো। কেমন?'

'জি।'

'বেশ; নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু তুমি যতদিন ফিরে না আসছ ততদিনের জন্যে আমার রসদ দরকার। এই নাও টাকা, বাজারে গিয়ে আরো সের দুই দই, কড়া পাকের সন্দেশ, গোটা দুই বড় পাঁউরুটি, মাখন, মারমালেড, টিনের দুধ, আঙুর, আপেল—এই সব কিনে নিয়ে এসো, ফ্রিজে থাকবে। তুমি বাজারে যাও, আমি ইতিমধ্যে টেলিফোনে তোমার এয়ার-টিকিটের ব্যবস্থা করছি।'—

পরদিন মেঘরাজ চলে গেল। বেণীমাধব একলা রইলেন। দই এবং অন্যান্য সাত্ত্বিক আহারের ফলে দু'-তিন দিনের মধ্যেই তাঁর পেট সুস্থ হলো। তিনি অবসর বিনোদনের জন্য ডাক্তার সেন ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে টেলিফোনে গল্প করেন। ঘরের মধ্যে কারুর যাওয়া-আসা নেই। দরজা সর্বদা বন্ধ থাকে।

চতুর্থ দিন মেঘরাজ ফিরে এল। সঙ্গে বৌ।

বৌ-এর পরনে রঙিন শাড়ি, মুখে ঘোমটা। মেঘরাজ বেণীমাধবের ঘরে গিয়ে বৌ-এর মুখ থেকে ঘোমটা সরিয়ে দিল। বেণীমাধব দেখলেন, একটি মিষ্টি হাসি-হাসি মুখ। রঙ ময়লা, কাজল-পরা চোখে যৌবনের মাদকতা। মেঘরাজের অনুপাতে বয়স অনেক কম, কুড়ি-বাইশের বেশি নয়। বৌ দু'হাত দিয়ে বেণীমাধবের পা ছুঁয়ে নিজের মাথায় ঠেকাল।

বেণীমাধব প্রসন্ন হয়ে বললেন—'বেশ বেশ। কি নাম তোমার?'

বৌ বলল—'মেদিনী।'

অতঃপর বেণীমাধবের স্বাধীন সংসারযাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। নীচের তলায় কোণের একটা ঘরে মেঘরাজ ও মেদিনীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হলো। তেতলায় একটা ঘর রান্নাঘরে পরিণত হয়েছে, বাসন-কোসন এসেছে; সকালবেলা মেদিনী নীচের ঘর থেকে ওপরে উঠে এসে বেণীমাধবের চা টোস্ট তৈরি করে দেয়। ইতিমধ্যে মেঘরাজ গড়িয়াহাট থেকে বাজার করে আনে। রান্না আরম্ভ হয়; তিনজনের রান্না। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মেদিনী নীচে

নিজের ঘরে চলে যায়, মেঘরাজ ওপরে পাহারায় থাকে। বিকেলবেলা থেকে আবার চা ও রান্নার পর্ব আরম্ভ হয় ; রাত্রি আটটার সময় সকলের নৈশাহার শেষ হলে মেদিনী রাত্রির মত নীচে চলে যায় ; বেণীমাধব তুষ্ট মনে শয্যা আশ্রয় করেন, মেঘরাজ দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার সামনে নিজের বিছানা পাতে।

এই হলো তাদের দিনচর্যা।

মেদিনীর দুপুরবেলা কোনো কাজ নেই, সেই অবসরে সে বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট ; বিশেষত পুরুষেরা। তার আচরণে শালীনতা আছে সংকোচ নেই ; তার কথায় সরসতা আছে প্রগল্‌ভতা নেই। সকলেই তার কাছে স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে। সে আসার পর থেকে বাড়িতে যেন নতুন সজীবতা দেখা দিয়েছে। গায়ত্রী এবং আরতির মন আগে থাকতে মেদিনীর প্রতি বিমুখ ছিল, কিন্তু ক্রমশ তাদের বিমুখতা অনেকটা দূর হয়েছে। কেবল মকরন্দ মেদিনীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ; মেদিনীর যখন অবসর মকরন্দ তখন বাড়িতে থাকে না।

বাড়িতে আস্তে আস্তে সহজ ভাব ফিরে এল। বেণীমাধব এখন নিজেকে অনেকটা নিরাপদ বোধ করছেন। তবু তাঁর মনের ওপর যে ধাক্কা লেগেছে তার জের এখনো কাটেনি। গভীর রাত্রে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে তিনি ভাবেন—আমার নিজের ছেলে নিজের মেয়ে আমার মৃত্যু কামনা করে। এ কি সম্ভব, না আমার অলীক সন্দেহ ? অনেকক্ষণ জেগে থেকে তিনি নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে ওঠেন, নিঃশব্দে ভেজানো দরজা একটু ফাঁক করে দেখেন, বাইরে মেঘরাজ দরজা আগলে ঘুমোচ্ছে। আশ্বস্ত মনে তিনি বিছানায় ফিরে যান।

মেদিনী আসার পর আর একটা সুবিধা হয়েছে। কলকাতার রেওয়াজ অনুযায়ী সদর দরজা সব সময়েই বন্ধ থাকে, কেবল যাতায়াতের সময় খোলা হয়। আগে বাইরে থেকে কেউ এলে দোর-ঠেলাঠেলি হাঁকাহাঁকি করতে হতো, এখন তা করতে হয় না। মেদিনীর ঘর সদর দরজার ঠিক পাশেই, রাত্রিবেলা বাইরে থেকে কেউ দরজায় টোকা দিলেই মেদিনী এসে দরজা খুলে দেয়।

মহাকবি কালিদাস লিখেছেন—হ্রদের প্রসন্ন উপরিভাগ দেখে বোঝা যায় না তার গভীর তলদেশে হিংস্র জলজন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মাসখানেক কাটল। ইতিমধ্যে বাড়িতে ছোটখাটো কয়েকটা ঘটনা ঘটেছিল যা উল্লেখযোগ্য—

নিখিল আবার অদৃশ্য নায়িকার চিঠি পেয়েছে—আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি হাসতে জানো, হাসাতে জানো। আমাদের বাড়িতে কেউ হাসে না। তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?

চিঠি পেয়ে নিখিল আহ্লাদে প্রায় দড়ি-ছেঁড়া হয়ে উঠল ; চিঠি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নিজের ঘরে পাগলের মত দাপাদাপি করল, তারপর সনতের ঘরে গেল। নিখিলের ঘরটা আকারে-প্রকারে সনতের অনুরূপ, কিন্তু অত্যন্ত অগোছালো। তক্তপোশের ওপর বিছানাটা তাল পাকিয়ে আছে, টেবিলের ওপর ধুলোর পুরু প্রলেপ। দেখে বোঝা যায়—এ ঘরে গৃহিণীর করস্পর্শের প্রয়োজন আছে।

সনৎ তখন ক্যামেরা নিয়ে বেরুচ্ছিল। নিখিল বলল—'এ কি সনৎদা, সজ্জিত-গুজ্জিত হয়ে চলেছ কোথায় ?'

সনৎ বলল—'গ্র্যান্ড হোটেলে পার্টি আছে। হাতে ওটা কি ?'

নিখিল চিঠি তুলে ধরে বলল—'আবার চিঠি পেয়েছি, পড়ে দেখ। এ মেয়ে কালো কুচ্ছিত হোক, কানা খোঁড়া হোক, একেই আমি বিয়ে করব।'

সনৎ চিঠি পড়ে বলল—'হুঁ, কানা-খোঁড়াই মনে হচ্ছে। তা বিয়ে করতে চাও কর না, কে তোমাকে আটকাচ্ছে। কিন্তু তার আগে মেয়েটাকে খুঁজে বার করতে হবে তো!'

সনৎ নিজের ঘরে তালা বন্ধ করল। মেঘরাজের ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখল মেদিনী ঘরে রয়েছে। সনৎ একবার দাঁড়িয়ে বলল—'মেদিনী, আজ আমার ফিরতে দেরি হবে। একটা পার্টিতে ফটো তুলতে যাব, কখন ফিরব ঠিক নেই। আমি দোরে টোকা দিলে দোর খুলে দিও।'

মেদিনী নিজের দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে এখন বাংলা ভাষা বেশ বুঝতে পারে, কিন্তু বলতে পারে না। চোখ নীচু করে সে নম্রস্বরে বলল—'জি।'

সনৎ বেরিয়ে যাওয়ার পর নিখিল মেদিনীর কাছে এসে দাঁড়াল, বলল—'মেদিনী, তুম জানতা হ্যায়, একঠো লেড়কি হামকো ভালবাসামে গির গিয়া। হাম উসকে শাদি করেগা।'

মেদিনীর চোখে কৌতুক নেচে উঠল, সে আঁচল দিয়ে হাসি চাপা দিতে দিতে দোর ভেজিয়ে দিল।

মেদিনী আসার পর থেকে গঙ্গাধরের চিত্ত চঞ্চল হয়েছে। বয়সটা খারাপ ; যৌবন বিদায় নেবার আগে মরণ-কামড় দিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গাধর যখন বিকেলবেলা বাইরে যায় তখন মেদিনীর দোরের দিকে তাকাতে তাকাতে যায়, কদাচ মেদিনীর সঙ্গে চোখাচোখি হলে চোখ সরিয়ে নেয় না, একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ; মেদিনী চৌকাঠে ঠেস দিয়ে চোখ নীচু করে তার দৃষ্টিপ্রসাদ গ্রহণ করে। পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টিতে সে অভ্যস্ত।

অজয়ের ভাবভঙ্গী একটু অন্যরকম। সে যেন মেদিনীকে দেখে বাৎসল্য স্নেহ অনুভব করে ; তার সঙ্গে পাটিচাটি গল্প করে, তার দেশের খবর নেয়। মেদিনী সরলভাবে কথা বলে, মনে মনে হাসে।

মকরন্দ প্রথমদিকে কিছুদিন মেদিনীকে দেখেনি। একবার তিন-চারদিন সে বাড়ি ফিরল না ; জানা গেল পুলিস ভ্যান লক্ষ্য করে ইঁট ছোঁড়ার জন্যে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। চতুর্থ দিন সে মুক্তি পেয়ে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় এসে বাড়ির সদর দরজায় ধাক্কা দিল। মেদিনী গিয়ে দোর খুলল। মকরন্দর চেহারা শুকনো, জামা ছেঁড়া, চুল উস্কখুস্ক ; সে তীব্র দৃষ্টিতে মেদিনীর পানে চেয়ে রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল—'তুমি কে?'

'আমি মেদিনী।'

'অ—মেঘরাজের বৌ।' কুটিলভাবে মুখ বিকৃত করে সে মেদিনীকে আপাদমস্তক দেখল, তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেল। মেদিনী জানত মকরন্দ কে, সে মুখ টিপে হেসে নিজের ঘরে ফিরে গেল।—

তিন মাস কেটে যাবার পরও যখন বেণীমাধবের পেটের আর কোনো গণ্ডগোল হলো না তখন তিনি নিঃসংশয়ে বুঝলেন তাঁর পেটের কোনো দোষ নেই, হজম করার শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে। পুত্রবধূ এবং মেয়ের প্রতি তাঁর সন্দেহ নিশ্চয়তায় পরিণত হলো। তারপর একদা গভীর রাত্রে বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কে যেন ছুরি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তার গলা কাটছে।

তারপর তিনি আর ঘুমোতে পারলেন না। বাকি রাত্রিটা চিন্তা করে কাটালেন। মৃত্যুভয়ে জড়িত ঐহিক চিন্তা।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় তিনি তাঁর সলিসিটারকে টেলিফোন করলেন—'সুধাংশুবাবু, আমি উইল করতে চাই। বেশি নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, আপনি একবার আসবেন?'

বেণীমাধব পুরনো মক্কেল, মালদার লোক। সুধাংশুবাবু বললেন—'বিকেলবেলা যাব।'

বিকেলবেলা সুধাংশুবাবু এলেন। দোর বন্ধ করে দু'জনে প্রায় দেড় ঘন্টা উইলের শর্তাদি আলোচনা করলেন ; সুধাংশুবাবু অনেক নোট করলেন। শেষে বললেন—'পরশু আমি উইল তৈরি করে নিয়ে আসব, আপনি উইল পড়ে দস্তখত করে দেবেন। দু'জন সাক্ষীও আমি সঙ্গে আনব।'—

সন্ধ্যের পর সনৎ আর নিখিল বেণীমাধবের কাছে এসে বসল, কুশল প্রশ্ন করল। মেদিনী পাশের ঘরে রান্না করছিল ; বেণীমাধব ভাগনেদের চা ও আলুভাজা খাওয়ালেন।

ওরা চলে যাবার পর বেণীমাধব মেঘরাজকে ডেকে বললেন—'দোতলা থেকে সকলকে ডেকে নিয়ে এসো।'

দোতলায় মকরন্দ ছাড়া আর সকলেই ছিল, সমন পেয়ে ছুটে এল। ঝিল্লী আর লাবণিও এল। বেণীমাধব খাটের ধারে বসেছিলেন, দুই নাতনীকে ডেকে নিজের দু' পাশে বসালেন, তারপর ছেলে-বৌ মেয়ে-জামাই-এর পানে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—'আমি উইল করতে দিয়েছি। উইলের ব্যবস্থা আগে থাকতে তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই।'

সকলে সশঙ্ক মুখে চেয়ে রইল। বেণীমাধব ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—'আমার মৃত্যুর পর আমার নগদ সম্পত্তি তোমরা হাতে পাবে না। অ্যানুইটির ব্যবস্থা করেছি ; তোমরা এখন যেমন মাসহারা পাচ্ছ তেমনি পাবে। কোনো অবস্থাতেই যাতে তোমাদের অর্থকষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে মাসহারার টাকার অঙ্ক ধার্য করেছি। বাড়িটা যতদিন তোমরা বেঁচে থাকবে ততদিন সমান ভাগ করে ভোগ করবে, বিক্রি করতে পারবে না।'

চারজনে মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে রইল। বেণীমাধব দুই নাতনীর কাঁধে হাত রেখে বললেন—'ঝিল্লী আর লাবণির জন্যে আমি আগে থেকেই মেয়াদী বীমা করে রেখেছি, একুশ বছর বয়স পূর্ণ হলে ওরা প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে। তাছাড়া আমি ঠিক করেছি ওদের বিয়ে দিয়ে যাব। তোমাদের মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হবে না। লাবণির জন্যে একটি ভাল পাত্র আছে ; ছেলেটি মিলিটারিতে লেফটেনেন্ট। ঝিল্লীর জন্যে মনের মত পাত্র এখনো পাইনি, পেলেই একসঙ্গে দু'জনের বিয়ে দেব।' তাঁর মুখে একটু প্রসন্নতার ভাব এসেছিল, আবার তা মুছে গেল ; তিনি ভ্রূকুটি করে বললেন—'মকরন্দকেও আলাদা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে বড় অসভ্য বেয়াদব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে কিছু দেব না।'

বেণীমাধব চুপ করলেন, তাঁর শ্রোতারাও চুপ করে রইল ; কারুর মুখে কথা নেই। শেষে গঙ্গাধর একটু কেশে অস্পষ্টভাবে বলল—'আপনার সম্পত্তি আপনি যেমন ইচ্ছে ব্যবস্থা করুন, আমাদের বলবার কিছু নেই। তবে টাকার দর আজ এক রকম কাল এক রকম—'

গায়ত্রী স্বামীর কথায় বাধা দিয়ে ভারী গলায় বলল—'বাবা, তুমি যা দেবে তাই মাথা পেতে নেব। উইল কি সই হয়ে গেছে ?'

বেণীমাধব কারুর দিকে তাকালেন না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—'উকিলকে উইল তৈরি করতে দিয়েছি, কাল পরশু সই দস্তখত হবে। হ্যাঁ, একটা শর্তের কথা তোমাদের বলা হয়নি। উইলের শর্ত থাকবে, যদি আমার অপঘাত মৃত্যু হয় তাহলে তোমরা কেউ আমার এক পয়সা পাবে না, সব সম্পত্তি পাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।'

এই কথা শুনে সকলে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রি হলো। যথাসময়ে বেণীমাধব নৈশাহার সম্পন্ন করে শয্যা নিলেন। মেঘরাজ ও

মেদিনী পাশের ঘরে খাওয়াদাওয়া করল ; মেঘরাজ সামনের দরজা ভেজিয়ে দরজা আগলে বিছানা পাতল, মেদিনী নিজের ঘরে গেল।

ওদিকে দোতলায় থমথমে ভাব। লাবণির নাচের মাস্টার এসেছিল, কিন্তু বাড়িতে কারুর নাচের প্রতি রুচি নেই। পরাগ আর লাবণি আড়ালে কথা বলল, তারপর চুপিচুপি নিঃশব্দে সিনেমা দেখতে চলে গেল। কেউ তাদের যাওয়া লক্ষ্য করল কিনা সন্দেহ।

নিখিল সন্ধ্যের পরই কাজে চলে গিয়েছিল ; সে নিশাচর মানুষ, সারা রাত কাজ করে, সকালবেলা ফিরে আসে।

রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় সনৎ ক্যামেরা নিয়ে বেরুল, মেদিনীর দোরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল—'মেদিনী, আমি বর্ধমানে যাচ্ছি, কাল সকালে সেখানে একটা নাচগানের মজলিশ আছে। কাল বিকেলের দিকে কোনো সময় ফিরব। আমার জন্যে আজ রাত্রে তোমাকে দোর খুলতে হবে না।' বলে একটু হাসল।

মেদিনী ক্ষণকাল তার চোখে চোখ রেখে বলল—'জি।'

সনৎ চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে মকরন্দ এল, মেদিনীকে কড়া সুরে বলল—'দোর বন্ধ করে দাও। রাত্রে কেউ যদি বাইরে থেকে এসে আমার খোঁজ করে, বলবে আমি বাড়ি নেই।' উত্তরের অপেক্ষা না করে সে ওপরে চলে গেল। মেদিনী সদর দরজায় খিল লাগাল।

তারপর বাড়ির ওপর রাত্রির রহস্যময় যবনিকা নেমে এল।

পরদিন ভোরবেলা মেদিনী সদর দরজা খুলতে গিয়ে দেখল, কবাট ভেজানো আছে কিন্তু খিল খোলা। সে ভুরু কুঁচকে একটু ভাবল, তারপর কবাট একটু ফাঁক করল ; বাইরে নিখিলকে দেখা গেল, সে কাজ শেষ করে ফিরছে। মেদিনীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে হেসে বলল—'তোমরা কাম শুরু হুয়া হামারা কাম শেষ হুয়া। এবার খুব ঘুমায়গা।'

নিখিল নিজের ঘরে চলে গেল। মেদিনী দরজা ফাঁক করে রাখল, কারণ দোতলায় ঝি কাজ করতে আসবে। তারপর সে কর্তার চা তৈরি করার জন্যে সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় চলল।

মিনিটখানেক কাটতে না কাটতে তিনতলা থেকে স্ত্রীকণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ এল, তারপর ধপ করে শব্দ। নিখিল তার ঘরে গায়ের জামা খুলে গেঞ্জি খোলবার উপক্রম করছিল, তীব্র চীৎকার শুনে সেই অবস্থাতেই ওপরে ছুটল। দোতলা থেকেও সকলে বেরিয়ে এসেছিল, সকলে প্রায় একসঙ্গে তেতলায় গিয়ে পৌঁছল। তারপর বেণীমাধবের দোরের সামনে ভয়াবহ দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মেঘরাজ বিছানার ওপর ঊর্ধ্বমুখে পড়ে আছে, তার গলা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত কাটা ; বালিশ এবং বিছানার ওপর পুরু হয়ে রক্ত জমেছে। মেদিনী তার পায়ের দিকে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ কারুর মুখ দিয়ে কথা সরল না, তারপর নিখিল চেঁচিয়ে উঠল—'মামা—মামা বেঁচে আছেন তো ?'

গায়ত্রী, আরতি এবং ঝিল্লী কেঁদে উঠল, অজয় এবং গঙ্গাধর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল ; কারুর যেন নড়বার শক্তি নেই। নিখিল তখন মেঘরাজকে ডিঙিয়ে বন্ধ দোরে ঠেলা দিল। দোর খুলে গেল ; খোলা দোর দিয়ে দেখা গেল, বেণীমাধব খাটের ওপর শুয়ে আছেন, তাঁর গলায় নীচে গাঢ় রক্তের চাপ জমা হয়ে আছে। মেঘরাজকে যেভাবে যে-অস্ত্র দিয়ে গলা কাটা হয়েছে বেণীমাধবকে ঠিক সেইভাবে সেই অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

'কান্নার একটা কলরোল উঠল। নিখিল ক্ষণিকের জন্য জড়বৎ দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিল। প্রথমে নিজের সংবাদপত্রের অপিসে ফোন করল, তারপর থানায়।

তিন

ব্যোমকেশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখল, সদর দরজায় পুলিস পাহারা। কনস্টেবল ব্যোমকেশকে দেখে স্যালুট করল, বলল—'ইন্সপেক্টর সাহেব নীচের তলায় বসবার ঘরে আছেন।'

প্রশস্ত ড্রয়িংরুমে ইন্সপেক্টর রাখাল সরকার এবং দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর উপস্থিত ছিলেন; মধ্য টেবিল ঘিরে একটা ফাইল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ব্যোমকেশ প্রবেশ করতেই রাখালবাবু তার কাছে এসে দাঁড়ালেন, করুণ হেসে বললেন—'জড়িয়ে পড়েছি ব্যোমকেশদা। বেণীসংহার নামটা আপনি ঠিকই দিয়েছেন। বেণীসংহার শব্দের আসল মানে শুনেছি খোঁপা বাঁধা; মেয়েরা প্রথমে চুলের বিনুনি করে, তারপর বিনুনি জড়িয়ে খোঁপা বাঁধে। এ ব্যাপারও অনেকটা সেই রকম; এমন জটিল কুটিল তার বাঁধুনি যে বেণীসংহার উন্মোচন করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুনের মোটিভ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সন্দেহভাজন লোকের সংখ্যাও পাঁচজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ; তবু ঠিক কোন্ লোকটি এ কাজ করেছে তা ধরা যাচ্ছে না।'

'এসো, বসা যাক।' দু'জনে দুটো চেয়ারে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসলেন—'এবার বলো।'

রাখালবাবু কাল থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা ব্যোমকেশকে শোনালেন, প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়েও কয়েকটি তথ্য প্রকাশ পেল। ব্যোমকেশ বলল—'মোটিভ কি?'

'বুড়োর অগাধ টাকা। ছেলে এবং মেয়েকে মাসহারা দিত, কিন্তু তাতে তাদের মন উঠত না। ডাক্তার অবিনাশ সেন সন্দেহ করেন, মেয়ে এবং পুত্রবধূ বিষাক্ত খাবার খাইয়ে বুড়োকে মারবার চেষ্টা করছিল। তা যদি হয় তাহলে ছেলে এবং জামাইয়ের মধ্যে যড় আছে। যা দিনকাল পড়েছে কিছুই অসম্ভব নয়।'

'মেঘরাজকে মারবার উদ্দেশ্য কি?'

'মেঘরাজ রাত্রে বেণীমাধবের দোরের সামনে বিছানা পেতে শুতো। দোর ভেজানো থাকত, যাতে বেণীমাধব ডাকলেই সে ঘরে ঢুকতে পারে। সুতরাং তাকে বধ না করে ঘরে ঢোকা যায় না। তাকে ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকতে গেলে সে জেগে উঠবে। তাই তাকে আগে মারা দরকার হয়েছিল।'

'মারণাস্ত্রটা পাওয়া যায়নি?'

'না। তবে ময়না তদন্ত থেকে জানা গেছে যে, অস্ত্রটা খুব ধারালো ছিল। একই অস্ত্র দিয়ে দু'জনকে মেরেছে। অস্ত্রের এক টানে গলা দু ফাঁক হয়ে গেছে।'

'হত্যার সময়টা জানা গেছে?'

'স্থূলভাবে রাত্রি বারোটা থেকে তিনটের মধ্যে।'

'হুঁ। সন্দেহভাজন পাঁচজন কারা?'

'অজয় ও তার স্ত্রী আরতি, গায়ত্রী ও তার স্বামী গঙ্গাধর। এবং অজয়ের ছেলে মকরন্দ। মকরন্দকে মেঘরাজ একদিন বেণীমাধবের হুকুমে চড় মেরেছিল। ঝিল্লীকে বাদ দেওয়া যায়, সে ছেলেমানুষ, তার কোনো মোটিভ নেই।'

'মকরন্দ ছেলেটা করে কি?'

'পলিটিক্সের হুজুগ করে। কলেজে নাম লেখানো আছে, এই পর্যন্ত। সে-রাত্রে আন্দাজ ন'টার সময় বাড়িতে এসেছিল, তারপর রাত্রেই কখন বেরিয়ে গেছে কেউ জানে না। সেই যে পালিয়েছে আর ফিরে আসেনি। তার নামে হুলিয়া জারি করেছি।'

'বাড়িতে এখন কে কে আছে?'

'অজয় আরতি গঙ্গাধর গায়ত্রী ঝিল্লী নিখিল রায় সনৎ গাঙ্গুলী আর মেঘরাজের বিধবা মেদিনী। অজয়ের মেয়ে লাবণি সে-রাত্রে তার নাচের মাস্টারের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি। নিখিল আর সনৎ রাত্রে কাজে বেরিয়েছিল, তারা পরদিন ফিরে এসেছে। যারা বাড়িতে আছে তাদের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।'

'সকলের আঙুলের ছাপ নিয়েছ নিশ্চয়।'

'তা নিয়েছি।'

'খানাতল্লাশ করে কিছু পেলে?'

'সন্দেহজনক কিছু পাইনি।'

'বেশ; এবার জবানবন্দীর নথিটা দেখি।'

'এই যে।' রাখালবাবু টেবিল থেকে ফাইল তুলে নিয়ে ব্যোমকেশকে দিলেন। এই সময় সদর দরজায় কনস্টেবল এসে জানাল যে, সলিসিটার সুধাংশু বাগচী নামে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান। রাখালবাবু বললেন—'নিয়ে এসো।'

সুধাংশুবাবু ঘরে প্রবেশ করলেন, হাতে পাট করা খবরের কাগজ। রাখালবাবুর পানে চেয়ে বললেন—'আমি বেণীমাধববাবুর সলিসিটার। আজ খবরের কাগজ খুলেই দেখলাম—'

'বসুন।'

সুধাংশুবাবু একটি চেয়ারে বসলেন। রাখালবাবু তাঁর সামনে দাঁড়ালেন, ব্যোমকেশও এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন—'বেণীমাধববাবুর সঙ্গে কবে আপনার শেষ দেখা হয়েছিল?'

সুধাংশুবাবু বললেন—'পরশু। আমরা অনেকদিন ধরে তাঁর বৈষয়িক কাজকর্ম দেখাশোনা করে আসছি। পরশু তিনি আমাকে ফোন করে জানালেন যে, তিনি উইল করতে চান। আমি বিকেলবেলা এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। উইলে কি কি শর্ত থাকবে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন। আমি উইল তৈরি করে আজ তাঁকে দলিল দেখিয়ে সহি-দস্তখত করিয়ে নেব বলে সব ঠিক করে রেখেছিলাম, তারপর আজ সকালে কাগজ খুলে এই সংবাদ পেলাম।'

রাখালবাবু চকিতে একবার ব্যোমকেশের পানে চেয়ে বললেন—'উইলে কি কি শর্ত আছে আমাদের বলতে বাধা আছে কি?'

সুধাংশুবাবু বললেন—'অন্য সময় বাধা নিশ্চয় থাকত, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বাধা নেই। বরং আপনাদের সুবিধা হতে পারে।'

তিনি উইলের শর্তগুলি শোনালেন; অপঘাতে মৃত্যু হলে সমস্ত সম্পত্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাবে সে কথাও উল্লেখ করলেন।

বেলা এগারটা নাগাদ তিনি উঠলেন, বলে গেলেন—'যদি আমার কাছ থেকে আরো কিছু জানতে চান কিংবা উইল পড়ে দেখতে চান, আমার অফিসে খবর দেবেন।'

তিনি চলে যাবার পর রাখালবাবু বললেন—'মোটিভ আরো পাকা হলো। বুড়োকে আর দু'দিন বাঁচতে দিলেই এত বড় সম্পত্তিটা বেহাত হয়ে যেত।'

ব্যোমকেশ বলল—'হুঁ। আমি এবার উঠব। কিন্তু আগে বেণীমাধবের ঘরটা দেখে যেতে

চাই।'

'চলুন।'

দোতলার সিঁড়ির মাথায় একজন কনস্টেবল। তেতলায় বেণীমাধবের দরজায় তালা লাগানো, উপরন্তু একজন কনস্টেবল টুলে বসে পাহারা দিচ্ছে। মেঘরাজের রক্তাক্ত বিছানা পরীক্ষার জন্য স্থানান্তরিত হয়েছে।

রাখালবাবু পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুললেন, দু'জনে ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের মাঝখানে খাটের ওপর বিছানা নেই, আর সব যেমন ছিল তেমনি আছে। ব্যোমকেশ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে চোখ ফেরাল, তারপর অস্ফুট স্বরে বলল—'তোমরা অবশ্য সবই দেখেছ, তবু—'

রাখালবাবু ঘাড় নাড়লেন—'অধিকন্তু ন দোষায়।'

'লোহার সিন্দুকের চাবি কোথায় ছিল?'

'লোহার সিন্দুকের গায়ে লাগানো ছিল। সিন্দুকের মধ্যে তিনখানা একশো টাকার নোট ছিল, পাঁচ টাকা দশ টাকার নোট বা খুচরো টাকা পয়সা একটাও ছিল না। মনে হয় খুনী সিন্দুক খুলে টাকা পয়সা নিয়েছে কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে নম্বরী নোট নেয়নি।'

'হুঁ। সিন্দুকে আর কী ছিল?'

'কিছু দলিলপত্র, কিছু রসিদ, ব্যাঙ্কের খাতা ও চেকবুক। দুটো ব্যাঙ্কে টাকা আছে, সাকুল্যে প্রায় চল্লিশ হাজার। তাছাড়া শেয়ার সার্টিফিকেট ও fixed deposit আছে আন্দাজ এগারো লাখ টাকার। মালদার লোক ছিলেন। ছেলে আর মেয়েকে সাড়ে সাত শো টাকা হিসেবে মাসহারা দিতেন। তাঁর নিজের খরচ ছিল সাত শো টাকা, মেঘরাজকে মাইনে দিতেন আড়াই শো টাকা। চেকবুকের counter foil থেকে এইসব খবর জানা যায়।'

'সিন্দুকের ভিতরে কি বাইরে বেণীমাধব ছাড়া অন্য কারুর আঙুলের ছাপ আছে?'

'কারুর আঙুলের ছাপ নেই, একেবারে লেপা-পোঁছা।'

'হুঁ, আততায়ী লোকটি হুঁশিয়ার।' ব্যোমকেশ সিন্দুক খুলল না, ফ্রিজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল—'ফ্রিজে কারুর আঙুলের ছাপ ছিল?'

'ছিল। বেণীমাধব, মেঘরাজ এবং মেদিনী—তিনজনের আঙুলের ছাপ ছিল। আর কারুর ছাপ পাওয়া যায়নি।'

হাতল ধরে ব্যোমকেশ ফ্রিজ খুলল, ভিতরে আলো জ্বলে উঠল; ফ্রিজ চালু আছে। ভিতরে নানা জাতের ফলমূল। সারি সারি ডিম, মাছ, মাংস, দুধের বোতল রয়েছে। ব্যোমকেশ আবার দোর বন্ধ করে দিল।

ঘরের পিছন দিকের দেয়ালে একটা লম্বা ধরনের আয়না টাঙানো ছিল, তার নীচে তাকের ওপর চিরুনী বুরুশ চুলের তেল ও দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। দাড়ি কামাবার সরঞ্জামের বিশেষত্ব এই যে, ক্ষুরটি সেফটি রেজর নয়, সাবেক কালের ভাঁজ-করা লম্বা ক্ষুর। ব্যোমকেশ সন্তর্পণে খাপসুদ্ধ ক্ষুর তুলে নিয়ে বলল—'ক্ষুরটা বের করে দেখেছ নাকি?'

রাখালবাবু চক্ষু একটু বিস্ফারিত করলেন, বললেন—'না। বেণীমাধব নিজের হাতে দাড়ি কামাতেন না, মেঘরাজ রোজ সকালে দাড়ি কামিয়ে দিত।'

ব্যোমকেশ সাবধানে ক্ষুরটি খাপ থেকে বের করে দু' আঙুলে ধরে জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে উল্‌টে-পাল্‌টে দেখতে লাগল। তারপর বিস্মিত স্বরে বলল—'আশ্চর্য!'

ব্যোমকেশ ক্ষুরটি তাঁর হাতে দিয়ে বলল—'দেখ, কোথাও আঙুলের ছাপ নেই।'

ক্ষুর নিয়ে রাখালবাবু পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করলেন, তারপর ক্ষুর ব্যোমকেশকে ফেরত দিয়ে

তার মুখের পানে চাইলেন ; দু'জনের চোখ বেশ কিছুক্ষণ পরস্পর আবদ্ধ হয়ে রইল। তারপর ব্যোমকেশ ক্ষুরটি খাপের মধ্যে পুরে নিজের পকেটে রাখল, বলল—'এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'কি করবেন ?'

'দাড়ি কামাব।'

তেতলার অন্য ঘর দু'টিতে দর্শনীয় কিছু ছিল না। তবু ব্যোমকেশ ঘর দু'টিতে ঘুরে ফিরে দেখল ; তারপর নীচের তলায় নেমে এসে রাখালবাবুকে বলল—'আমি এখন চললাম। বিকেলবেলা আবার আসব। জবানবন্দীর ফাইলটা দাও, বাড়ি গিয়ে পড়ব।'

রাখালবাবু বললেন—'আমাকে একবার থানায় যেতে হবে, চলুন আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই। কি রকম মনে হচ্ছে ?'

ব্যোমকেশ মুচকি হেসে বলল—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—'

রাখালবাবু জবানবন্দীর ফাইল ব্যোমকেশকে দিলেন, তাকে নিয়ে পুলিস ভ্যানে চলে গেলেন। দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর, এবং কয়েকজন নিম্নতর কর্মচারী বাড়িতে মোতায়েন রইল।

বিকেল তিনটের সময় ব্যোমকেশ ফিরে এল। রাখালবাবু আগেই ফিরেছিলেন, তাঁকে ক্ষুর আর জবানবন্দীর নথি ফেরত দিয়ে ব্যোমকেশ একটা চেয়ারে বসল। রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন—'কেমন দাড়ি কামালেন ?'

ব্যোমকেশ মাথা নেড়ে বলল—'ভাল নয়।'

'আর জবানবন্দী ?'

'মেদিনীর জবানবন্দী সবচেয়ে তথ্যপূর্ণ। তাকে আরো কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

'বেশ তো, তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। সে নিজের ঘরেই আছে।'

কিন্তু মেদিনীকে ডেকে পাঠাবার আগেই দু'জন সাদা পোশাকের পুলিস কর্মচারী মকরন্দকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। মকরন্দর কাপড়-জামা ছিঁড়ে গেছে, গায়ে মুখে ধুলোবালি, চোখ জবাফুলের মত লাল। বেশ বোঝা যায় সে স্বেচ্ছায় বিনা যুদ্ধে পুলিসের হাতে ধরা দেয়নি। একজন সাদা পুলিস বলল—'মকরন্দ চক্রবর্তীকে ধরেছি স্যার।'

রাখালবাবু মকরন্দর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন—'ইনিই মকরন্দ চক্রবর্তী! কোথায় ধরলে ?'

'ঘোড়দৌড়ের মাঠে। রেস খেলছিল স্যার। পকেটে অনেক টাকা ছিল। এই যে।'

এক তাড়া পাঁচ টাকা ও দশ টাকার নোট। রাখালবাবু গুনে দেখলেন, পৌনে দু' শো টাকা। তিনি মকরন্দকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করলেন—'তোমার নাম মকরন্দ চক্রবর্তী ?'

মকরন্দ রক্তরাঙা চোখে চেয়ে রইল, উত্তর দিল না। রাখালবাবু আবার প্রশ্ন করলেন—'তুমি পৌনে দু' শো টাকা কোথায় পেলে ?'

উদ্ধত উত্তর হলো—'বলব না।'

'যে-রাত্রে তোমার ঠাকুরদা খুন হন সে-রাত্রে ন'টার সময় তুমি বাড়ি এসেছিলে, তারপর শেষরাত্রে চুপিচুপি দোর খুলে বেরিয়ে গিয়েছিলে—'

'মিছে কথা। মেদিনী মিছে কথা বলেছে।'

'মেদিনী বলেছে জানলে কি করে ?'

মকরন্দ অধর দংশন করল, উত্তর দিল না। রাখালবাবু আবার প্রশ্ন করলেন—'কত রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে ?'

'বলব না।'

'তারপর আর বাড়ি ফিরে আসনি কেন ?'

'বলব না।'

রাখালবাবু তার খুব কাছে এসে বললেন—'একদিন বেণীমাধববাবুর হুকুমে মেঘরাজ তোমার কান ধরে গালে চড় মেরেছিল, গলাধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল।'

'মিছে কথা।'

'বাড়িসুদ্ধ লোক মিছে কথা বলছে?'

'হ্যাঁ।'

রাখালবাবু ফিরে এসে ব্যোমকেশের পাশে বসলেন, গলা খাটো করে বললেন—'এটাকে নিয়ে কী করা যায় বলুন দেখি?'

ব্যোমকেশও নীচু গলায় বলল—'যুগধর্মের নমুনা। ওকে বাড়িতেই আটক রাখ।'

'তাই করি।' রাখালবাবু উঠে গিয়ে মকরন্দকে কড়া সুড়ে বললেন—'যাও, দোতলায় নিজের ঘরে থাকো গিয়ে। বাড়ি থেকে বেরুবার চেষ্টা কোরো না, চেষ্টা করলে হাজতে গিয়ে লাপ্‌সি খেতে হবে। যাও।'

সাদা পোশাকের পুলিস দু'জন মকরন্দকে দোতলায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। রাখালবাবু বললেন—'মেদিনীকে ডেকে পাঠাই?'

ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'না, চল আমরাই তার ঘরে যাই। এখানে অনেক বাধাবিঘ্ন।'

মেদিনীর দোরে টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখা গেল মেদিনী মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে আছে। ব্যোমকেশ ও রাখালবাবুকে দেখে সে উঠে বসল। তার পরনে ধূসর রঙের একটা শাড়ি, কপালে সিঁদুর নেই, হাতে গলায় কানে গয়না নেই। মুখের ভাব একটু ফুলো ফুলো; শোকের চিহ্ন এখনো মুখ থেকে মুছে যায়নি, কিন্তু শোকের অধীরতা দূর হয়েছে। সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্নভরা চোখে দু'জনের পানে চাইল।

রাখালবাবু সদয় কণ্ঠে বললেন—'মেদিনী, ইনি আমার বন্ধু। আমি তোমাকে যেসব প্রশ্ন করেছি তার ওপর ইনি আরো দু'-চারটে সওয়াল করতে চান।'

মেদিনী ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় বলল—'জি।'

ব্যোমকেশ একদৃষ্টে মেদিনীর মুখের পানে চেয়ে ছিল, আরো কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—'কতদিন আগে মেঘরাজের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল?'

মেদিনী অস্ফুট কণ্ঠে বলল—'পাঁচ বছর আগে।'

'তুমিই তার প্রথম স্ত্রী?'

'জি, না। আগে একজন ছিল, সে মারা গেছে।'

'হুঁ।' ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে চাইল। ঘরে ফার্নিচারের মধ্যে একটা তক্তপোশ, একটা কাঠের আলমারি এবং একটা খাড়া আলনা। তক্তপোশের তলায় গোটা দুই বড় তোরঙ্গ দেখা যাচ্ছে। বাইরের দিকের জানালার পাটার ওপর একটা কাঠের চ্যাপটা বাক্স। পশ্চিমা মেয়েরা প্রসাধনের জন্যে এই ধরনের বাক্স ব্যবহার করে; বাক্সের মধ্যে সিঁদুর কৌটো চিরুনী তেল কাজল প্রভৃতি থাকে, ডালা খুললে ডালার গায়ে আয়না বেরিয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে নিতান্ত মামুলি পরিবেশ।

ব্যোমকেশ এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করল—'বাড়ির সকলকেই তুমি চেন। কে কেমন মানুষ বলতে পার?'

মেদিনী একটু চুপ করে থেকে হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল—'বুঢ়া বাবা বড় ভাল আদমি ছিলেন, দিলদার লোক ছিলেন। তাঁর ছেলে আর দামাদও ভাল লোক। মেয়ে আর

পুতহু আমাকে পছন্দ করেন না। ঝিল্লী দিদি আর লাবণি দিদি ভারি ভাল মেয়ে।'

'আর মকরন্দ ?'

মেদিনী চকিতে চোখ তুলেই আবার নীচু করল—'উনি আমাকে দেখতে পারেন না। ভারি কড়া জবান।'

'মেঘরাজ তাকে চড় মেরেছিল তুমি জানো ?'

'জি হাঁ, আমি তখন পাশের ঘরে ছিলুম।'

'নিখিল আর সনৎ ?'

'নিখিলবাবু মজাদার লোক, খুব ঠাট্টা তামাসা করেন। আর সনৎবাবু গম্ভীর মেজাজের মানুষ। কিন্তু দু'জনেই খুব ভদ্র।'

'আচ্ছা, ওকথা থাক। মেঘরাজ সৈন্যদলের সিপাহী ছিল, তার সিপাহী-জীবন সংক্রান্ত কাগজপত্র নিশ্চয় তোমার কাছে আছে ?'

'জি আছে, তার বাক্সের মধ্যে আছে।'

'আমি একবার কাগজপত্রগুলো দেখতে চাই।'

'এই যে বার করে দিচ্ছি।'

সে গিয়ে তক্তপোশের তলা থেকে একটা ট্রাঙ্ক টেনে বার করল, আঁচল থেকে চাবি নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ট্রাঙ্ক খুলতে লাগল। ব্যোমকেশ ইতিমধ্যে ঘরের এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জানলার ওপর প্রসাধনের বাক্সটা রাখা আছে। ব্যোমকেশ একটু ইতস্তত করে বাক্সের ডালা তুলল। বাক্সের মধ্যে মেয়েলি প্রসাধনের দ্রব্য ও টুকিটুকি ; আয়নার এক কোণে মেদিনীর একটি ছবি আঁটা রয়েছে। পোস্টকার্ড আধখানা করলে যত বড় হয় তত বড় ছবি ; মেদিনী খাটের ধারে বসে রয়েছে। নিতান্তই ঘরোয়া ছবি, মেদিনীর মুখের প্রাণখোলা হাসিটি ব্যোমকেশের গায়ে কাঁটার মত বিঁধল। মেদিনীর বর্তমান চেহারা দেখে ভাবা যায় না সে এমনভাবে হাসতে পারে। ব্যোমকেশ নিঃশব্দে বাক্স বন্ধ করল।

মেদিনী ট্রাঙ্ক থেকে কাগজপত্র নিয়ে যখন ফিরে এল তখন ব্যোমকেশ রাখালবাবুর কাছে ফিরে এসে নিম্নস্বরে কথা বলছে, মেদিনীর হাত থেকে কাগজপত্র নিয়ে সে মন দিয়ে পড়ল। রাখালবাবুও সঙ্গে সঙ্গে পড়লেন। তারপর কাগজ মেদিনীকে ফেরত দিয়ে ব্যোমকেশ মেদিনীকে বলল—'এগুলো যত্ন করে রেখে দাও, হয়তো পরে দরকার হবে। চল রাখাল।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাখালবাবু ব্যোমকেশের দিকে চোখ বেঁকিয়ে তাকালেন—'কি মনে হলো ?'

ব্যোমকেশ বলল—'খুব ভাল। এবার বাড়ির বাকি লোকগুলিকেও একে একে দেখতে চাই। সবাই বাড়িতে আছে তো ?'

'সবাই আছে, কেবল অজয়ের মেয়ে লাবণি ছাড়া। যে-রাত্রে খুন হয়, লাবণি সেদিন সন্ধ্যের সময় তার নাচের মাস্টারের সঙ্গে পালিয়েছে, এখনো তার সন্ধান পাইনি। অন্য যারা আছে তাদের মধ্যে আগে কাকে দেখতে চান ?'

'আমার কোনো পক্ষপাত নেই। নীচের তলা থেকেই আরম্ভ করা যাক।'

নিখিলের দোরে রাখালবাবু টোকা দিলেন, নিখিল এসে দোর খুলে দাঁড়াল। তার গালে সাবানের ফেনা, হাতে সেফটি রেজর ; সে ফেনায়িত হাসি হাসল—'আসুন দারোগাবাবু।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন, প্রশ্ন করলেন—'বিকেলবেলা দাড়ি কামাচ্ছেন ?'

নিখিল বলল—'আমি নিশাচর কিনা তাই বিকেলবেলা দাড়ি কামাই। যারা দিনের বেলা কাজ করে তারা সকালবেলা দাড়ি কামায়।' তারপর সে ব্যগ্রস্বরে বলল—'দারোগাবাবু, এক ঘন্টার জন্য আমাকে ছেড়ে দিন, একবারটি অফিস ঘুরে আসি। মাইরি বলছি পালাব না। বিশ্বাস না হয় দু'জন পেয়াদা আমার সঙ্গে দিন।'

রাখালবাবু হেসে বললেন—'অফিসে যাবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? বেশ তো আছেন।'

নিখিল বলল—'না দারোগাবাবু, বেশ নেই। কাজের নেশা আমাকে অফিসের দিকে টানছে, রাত্তিরে ঘুমোতে পারি না। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া আবার কি?'

নিখিল একটু সলজ্জভাবে বলল—'অফিসে অনেকগুলো আইবুড়ো মেয়ে কাজ করে, তাদের মধ্যে একটাকে আমি খুঁজছি, পেলেই তাকে বিয়ে করব।'

'ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় ঠেকছে।'

'ঠেকবেই তো। ঘোর রহস্যময় ব্যাপার।'

'ঘোর রহস্যময় যদি হয় তাহলে এঁর শরণাপন্ন হোন। ইনিই হলেন শ্রীব্যোমকেশ বক্সী।'

নিখিলের গালে সাবানের ফেনা শুকিয়ে ঝরে ঝরে পড়ছিল, সে প্রকাণ্ড হাঁ করে ব্যোমকেশের পানে তাকাল—'অ্যাঁ, আপনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী! এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি।' সেফ্‌টি রেজরসুদ্ধ হাত জোড় করে বলল—'আমার রহস্যটা আপনাকে ভেদ করতেই হবে ব্যোমকেশবাবু। নইলে আমার প্রাণের আশা নেই।'

'সব কথা খুলে বলুন।'

নিখিল তড়বড় করে এক নিশ্বাসে তার রহস্য শোনাল। শুনে ব্যোমকেশ বলল—'চিঠিগুলো দেখি।'

নিখিল বিছানার কাছে গিয়ে বালিশের তলা থেকে কয়েকখানা খাম এনে ব্যোমকেশকে দিল। ব্যোমকেশ খামগুলি খুলে একে একে চিঠি বার করে পড়ল, তারপর আবার খামের মধ্যে পুরে নিজের পকেটে রাখল—'এগুলো আমি রাখলাম। দেখি যদি সন্ধান পাই। আপনি আপাতত এই বাড়িতেই থাকুন, আমি আপনার অফিসে খোঁজখবর নেব।—ভাল কথা, আপনার বর্ষাতি আছে?'

'বর্ষাতি—ওয়াটারপ্রুফ? আছে একটা। কেন বলুন তো?'

'দেখি একবার।'

নিখিল সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে একটা পুরনো খাকি রঙের বর্ষাতি নিয়ে এল। ব্যোমকেশ সেটা রাখালবাবুর হাতে দিয়ে বলল—'এটাও আমরা নিয়ে চললাম। এটা আপনি শেষবার কবে ব্যবহার করেছেন?'

নিখিল কিছুই বুঝতে পারেনি এমনিভাবে মাথা চুলকে বলল—'গত বর্ষাকালে, মানে পাঁচ ছয় মাস আগে। আপনি যে ভেলকি লাগিয়ে দিলেন, ওয়াটারপ্রুফ থেকে আমার—মানে মেয়েটার ঠিকানা বার করবেন নাকি?'

ব্যোমকেশ কেবল মুখ টিপে হাসল, বলল—'আপনি দেখছি সেফ্‌টি রেজর দিয়ে দাড়ি কামান।'

'তবে কি দিয়ে দাড়ি কামাব?'

'ঠিক কথা। আপনি যখন দাড়ি কামাতে আরম্ভ করেছেন তখন সাবেক ক্ষুরের রেওয়াজ উঠে গেছে।—আচ্ছা।'

ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যোমকেশ রাখালবাবুর পানে বক্র কটাক্ষপাত করল। রাখালবাবু

অপ্রতিভভাবে বললেন—'খেয়াল হয়নি। হওয়া উচিত ছিল। যে-লোক ছুরি কিংবা ক্ষুর দিয়ে গলা কাটতে যাচ্ছে, সে জানে গলা কাটলে চারদিকে রক্ত উথলে পড়বে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। তার নিজের গায়েও রক্ত লাগবে। তাই সে বর্ষাতি কিংবা ওই রকম একটা কিছু গায়ে দিয়ে খুন করতে যাবে, যাতে সহজে রক্ত ধুয়ে ফেলা যায়।'

এই সময় সদর দোরের কনস্টেবল এসে একখানা পোস্টকার্ড রাখালবাবুর হাতে দিয়ে বলল—'পিওন দিয়ে গেল।'

রাখালবাবু নির্দ্বিধায় পোস্টকার্ড পড়লেন। অজয় চক্রবর্তীর নামে চিঠি, তারিখ আজ সকালের, ঠিকানা টালিগঞ্জ। চিঠিতে কয়েক ছত্র লেখা আছে—

শ্রীচরণেষু মা,

কাল রাত্তিরে আমাদের বিয়ে হয়েছে। তোমরা রাগ কোরো না। আমার শ্বশুর শাশুড়ি খুব ভালো লোক। পরশু রাত্রে আমি শাশুড়ির কাছে শুয়েছিলাম। দাদু অন্য একজনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছিলেন তাই আমরা লুকিয়ে বিয়ে করেছি।

প্রণতা
লাবণি

চিঠিতে চোখ বুলিয়ে রাখালবাবু ব্যোমকেশের হাতে চিঠি দিলেন, ব্যোমকেশ সেটা পড়ে ফেরত দিল। বলল—'বোধহয় ঠাকুরদার মৃত্যু-সংবাদ পায়নি। যাক, বিয়ে করেছে ভালই করেছে, নইলে—'

চিঠি পকেটে রেখে রাখালবাবু একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে ডাকলেন—'এই বর্ষাতিটা রাখো। আরো বোধহয় জুটবে ; সবগুলো জড় হলে পরীক্ষার জন্যে পাঠাতে হবে। এটাতে টিকিট সেঁটে রাখ—নিখিল হালদার।'

তারপর তিনি সনতের দোরে টোকা দিলেন। সনৎ এসে দোর খুলল ; তার হাতে একটা ইংরেজি রহস্য উপন্যাস পাতা ওলটানো অবস্থায় রয়েছে। রাখালবাবুকে দেখে বলল—'ইন্সপেক্টরবাবু, আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে, এক টিন আনিয়ে দেবেন ? গোল্ড ফ্লেক।'

'নিশ্চয়। টাকা দিন আনিয়ে দিচ্ছি।'

সনৎ একটা দশ টাকার নোট পকেট থেকে বার করে দিল। রাখালবাবু টাকা সাব-ইন্সপেক্টরের হাতে দিয়ে বললেন—'এক টিন গোল্ড ফ্লেক সিগারেট সামনের দোকান থেকে আনিয়ে দাও।'

তিনি ব্যোমকেশকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। সনৎ বলল—'আর কতদিন ঘরে বন্ধ করে রাখবেন ? কাজকর্ম আটকে রয়েছে। তা ছাড়া মামা মারা যাবার পর তাঁর উত্তরাধিকারী এখানে আর থাকতে দেবে না, মাথা গোঁজবার একটা জায়গা খুঁজতে হবে তো।'

'থাকতে দেবে না কি করে জানলেন ?'

'আজ দুপুরবেলা গায়ত্রীর স্বামী গঙ্গাধর এসেছিল, বলল—এবার পাতাতাড়ি গোটাতে হবে।'

'তাই নাকি।—বেশি দিন আপনাদের কষ্ট দেব না, দু'এক দিনের মধ্যে ছাড়া পাবেন। ইনি ব্যোমকেশ বক্সী, প্রখ্যাত সত্যান্বেষী।'

সনৎ নির্লিপ্ত চোখে ব্যোমকেশের পানে চাইল, নীরস স্বরে বলল—'নাম শুনেছি, বই পড়িনি। বাংলা রহস্য কাহিনী আমি পড়ি না।—বসুন।'

ব্যোমকেশের চোখ ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সে অলসভাবে বলল—'আপনার

বর্ষাতি আছে ?'

সনৎ ভ্রূ তুলে একটু বিস্ময় প্রকাশ করল—'আছে। এটা বর্ষাকাল নয় তাই তুলে রেখেছি। দেখতে চান ?'

'হ্যাঁ।'

সনৎ আলমারি খুলে একটা প্লাস্টিকের মোড়ক বার করল। মোড়কের মধ্যে একটি শৌখিন স্বচ্ছ বর্ষাতি পাট করা রয়েছে। রাখালবাবু সেটি নিয়ে মোড়ক থেকে বার করলেন, তারপর লম্বা করে ঝুলিয়ে দেখলেন। দামী বর্ষাতি, প্রায় নতুন। তিনি সেটিকে পাট করে আবার মোড়কের মধ্যে রেখে বললেন—'এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি, দু' দিন পরে ফেরত পাবেন। রসিদ দিচ্ছি।'

সনৎ অপ্রসন্ন উদাস কণ্ঠে বলল—'রসিদ কি হবে ! আপনাদেরই রাজত্ব, যা ইচ্ছে করুন।'

ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করল—'আপনার জবানবন্দীতে দেখলাম যে-রাত্রে বেণীমাধববাবু খুন হন সে-রাত্রে আপনি বর্ধমানে গিয়েছিলেন। কোন ট্রেনে গিয়েছিলেন ?'

সনৎ বলল—'রাত্রি সাড়ে দশটার ট্রেনে।'

'পরদিন ভোরের ট্রেনে না গিয়ে রাত্রির ট্রেনে গেলেন কেন ?'

'ভোরের ট্রেনে গেলে ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারতাম না। সকালবেলা মজলিশ ছিল।'

'বর্ধমানে আপনার কোনো আস্তানা আছে ?'

'না, স্টেশনের বেঞ্চিতে বসে রাত কাটিয়েছি।'

'চায়ের স্টলে গিয়ে চা খেয়েছিলেন নিশ্চয় ?'

'চা আমি খাই না।'

'তাহলে আপনি যে সাড়ে দশটার গাড়িতে বর্ধমান গিয়েছিলেন তার কোনো সাক্ষী-সাবুদ নেই ?'

সনতের ভুরু আবার উঁচু হলো—'সাক্ষী-সাবুদের কী দরকার ? আপনাদের কি সন্দেহ আমি মামাকে খুন করেছি ?'

ব্যোমকেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল—'তা নয়। কিন্তু সকলের সম্বন্ধেই আমাদের নিঃসংশয় হওয়া দরকার।'

সনৎ শুকনো গলায় বলল—'মামাকে খুন করে যাদের লাভ আছে তাদের অ্যালিবাই খুঁজুন গিয়ে। তাতে কাজ হবে।'

'তা বটে। চল রাখাল, এবার দোতলায় যাওয়া যাক।'

প্রথমে ড্রয়িংরুমে গিয়ে রাখালবাবু সনতের বর্ষাতি সাব-ইন্সপেক্টরকে সমর্পণ করে বললেন—'টিকিট মারো—সনৎ গাঙ্গুলি।' তারপর ব্যোমকেশকে নিয়ে দোতলায় উঠলেন।

অজয় সামনের ঘরে বসে সায়াহ্নিক চা জলখাবার খাচ্ছিল, সশঙ্ক মুখে উঠে দাঁড়াল। তার মুণ্ডকচ্ছ অশৌচের বেশ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। রাখালবাবু গম্ভীর মুখে বললেন—'আপনার একখানা চিঠি এসেছে।' তিনি পোস্টকার্ড পকেট থেকে নিয়ে অজয়কে দিলেন।

ব্যোমকেশ নিবিষ্ট চোখে অজয়ের পানে চেয়ে ছিল ; সে দেখল চিঠি পড়তে পড়তে অজয়ের মুখের ওপর দিয়ে দ্রুত পরম্পরায় বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি খেলে গেল : আশঙ্কা—বিস্ময়—স্বস্তি—উৎফুল্লতা। তার মধ্যে স্বস্তির আরামই বেশি। অজয়ের মত প্রকৃতির লোকের পক্ষে এটাই বোধহয় স্বাভাবিক ; বিনা খরচে বিনা ঝঞ্ঝাটে যদি মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় তাহলে আনন্দ হবারই কথা।

কিন্তু সে যখন মুখ তুলল তখন তার মুখে একটি বিষণ্ণ করুণ ভাব, তাতে রঙ্গমঞ্চের আভাস পাওয়া যায়। সে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল—'মেয়ে! দারোগাবাবু, আমার একমাত্র মেয়ে পালিয়ে গিয়ে একজনকে বিয়ে করেছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা বড় নিষ্ঠুর, বড় স্বার্থপর, তারা বাপ-মায়ের কথা ভাবে না। যাক, যা করেছে ভালই করেছে। তবু যদি জাতের মধ্যে বিয়ে করত। যাক, ভাল হলেই ভাল।' সে আবার নাটকীয় দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রাখালবাবু বোধকরি অভিনয়ের পালা শেষ করার জন্যেই বললেন—'ইনি ব্যোমকেশ বক্সী। বোধহয় নাম শুনেছেন।'

অজয় তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে রইল; তার ভাবভঙ্গীতে ভয় কিংবা বিস্ময় কিংবা আনন্দ কোনটা প্রকাশিত হলো ঠিক বোঝা গেল না। তারপর সে গদ্‌গদ স্বরে বলে উঠল—'নাম শুনিনি! বলেন কি আপনি, নাম শুনিনি! আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য আমার। ব্যোমকেশবাবু এসেছেন, এবার বাবার মৃত্যু রহস্যের একটা কিনারা হবে।' সে অন্দরের দরজার দিকে ফিরে গলা চড়িয়ে বলল—'ওগো শুনছ, শীগ্‌গির দু' পেয়ালা চা নিয়ে এসো।—বসুন বসুন, আমি নিজেই দেখছি।' সে দ্রুত অন্দরের দিকে অন্তর্হিত হলো।

সমাদরের আতিশয্য দেখে ব্যোমকেশ রাখালবাবুর পানে মুখ টিপে হাসল; দু'জনে পাশাপাশি চেয়ারে উপবিষ্ট হলেন।

কিছুক্ষণ পরে অজয় ফিরে এল, তার পিছনে মাথায় আধ-ঘোমটা দিয়ে আরতি; আরতির হাতে থালার ওপর দু' পেয়ালা চা এবং বিস্কুট। তার মুখ ভয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে, সে থালাটি ব্যোমকেশের সামনে রেখেই ফিরে যাচ্ছিল, অজয় বলল,—'ওকি, চলে যাচ্ছ কেন? ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গে কথা কও।'

আরতি থমকে দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশের দিকে ফিরল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। ব্যোমকেশ তার অবস্থা লক্ষ্য করে সদয় কণ্ঠে বলল—'না না, উনি কাজকর্ম করুন গিয়ে, ওঁকে আমার কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।'

আরতি চলে গেল। অজয় আমতা-আমতা করে বলল—'আমার স্ত্রী বড় লাজুক, কিন্তু আমরা দু'জনেই আপনার ভক্ত—' অজয় আরো অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল, ব্যোমকেশ বাধা দিয়ে বলল—'আপনার ছেলে মকরন্দ বাড়িতেই আছে তো?'

অজয় চকিত হয়ে বলল—'আছে বৈকি। তাকে ডাকব?'

ব্যোমকেশ বলল—'ডাকবার বোধহয় দরকার হবে না। সে কলেজে পড়ে, বর্ষাকালে নিশ্চয় তার বর্ষাতি দরকার হয়। তার বর্ষাতিটা একবার দেখতে চাই।'

অজয় একটু চিন্তা করে বলল—'বছর দেড়েক আগে তাকে একটা ওয়াটারপ্রুফ কিনে দিয়েছিলাম। আছে নিশ্চয়, আমি দেখছি।'

অজয় অন্দরের দিকে চলে গেল। ব্যোমকেশ ও রাখালবাবু চায়ের পেয়ালা তুলে নিলেন। মিনিট পাঁচেক পরে অজয় ফিরে এসে বিমর্ষ মুখে বলল—'ওয়াটারপ্রুফটা খুঁজে পেলাম না। মকরন্দকে জিজ্ঞেস করলাম, সে বলল—জানি না।'

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালা রেখে মুখ মুছতে মুছতে বলল—'আপনার নিজের ওয়াটারপ্রুফ আছে?'

'আছে। এনে দেব?'

'আপনার স্ত্রীর এবং মেয়ের ওয়াটারপ্রুফ?'

'মেয়েদের জন্যে একটাই মেয়েলি ওয়াটারপ্রুফ আছে।'

'দয়া করে ও দুটো এনে দিন, আমরা নিয়ে যাব। দু'চার দিনের মধ্যেই ফেরত পাবেন।'

'নিয়ে যাবেন, বেশ তো, তা এনে দিচ্ছি।'

অজয় অন্দরে গিয়ে দু'হাতে দুটি ওয়াটারপ্রুফ ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরে এল। রাখালবাবু সে দুটি পাট করে বগলে নিলেন, বললেন—'আচ্ছা, আজ উঠি। চায়ের জন্যে ধন্যবাদ।'

অজয় কাঁচুমাচু হয়ে ব্যোমকেশকে বলল—'চললেন? একটা অনুরোধ ছিল সাহস করে বলতে পারছি না—'

'কি অনুরোধ?'

'আপনার একটা ফটো তুলব। আমার ক্যামেরা আছে, যদি অনুমতি করেন একটা তুলে নিই। আপনার ছবি এনলার্জ করে ঘরে টাঙিয়ে রাখব।'

ব্যোমকেশ হেসে উঠল—'ফটো তুলবেন! তা—আপত্তি কি। আমার ছবি এনলার্জ করে ঘরে টাঙিয়ে রাখার আগ্রহ আজ পর্যন্ত কারো দেখা যায়নি।'

অজয় দ্রুত গিয়ে ক্যামেরা নিয়ে এল। সাধারণ বক্স-ক্যামেরা। সে বললে—'এখনো যথেষ্ট আলো আছে। আপনি জানালার কাছে দাঁড়ান, আমি ছবি তুলে নিচ্ছি।'

ব্যোমকেশ জানলার পাশে পড়ন্ত আলোয় দাঁড়াল। ক্যামেরায় ক্লিক করে শব্দ হলো।

'ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! অশেষ ধন্যবাদ!' শুনতে শুনতে ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

বাইরে এসে দু'জনের কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে কথা হলো; তারপর ব্যোমকেশ বর্ষাতি দুটো নিয়ে নীচে নেমে গেল, রাখালবাবু তেতলায় উঠে গেলেন। ওপরে কনস্টেবল টুলের ওপর বসেছিল, উঠে দাঁড়াল।

চাবি দিয়ে ঘরের দোর খুলে রাখালবাবু ঘরে প্রবেশ করলেন, কয়েকবার এদিক ওদিক ঘুরলেন। তারপর দোরের বাইরে ফিরে এসে দেখলেন, মেদিনী ক্লান্তভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন—'মেদিনী, তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি তাই ডেকেছি।'

মেদিনী ব্যায়ত বিহ্বল চোখে চাইল, তারপর চোখের ওপর আঁচল চাপা দিল। রাখালবাবু বললেন—'বলো দেখি সেদিন সকালে তুমি যখন তোমার স্বামীর মৃতদেহ প্রথম দেখলে তখন সে কি চিৎ হয়ে শুয়েছিল?'

অবরুদ্ধ উত্তর এল—'জি, হাঁ।'

রাখালবাবু তাড়াতাড়ি বললেন—'আচ্ছা আচ্ছা, ও কথা থাক। এবার একবার ঘরের মধ্যে এসো।'

মেদিনী চোখের জল মুছে থমথমে মুখ নিয়ে ঘরের মধ্যে এল। রাখালবাবু চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে বললেন—'ঘরটা ভাল করে দেখ। তুমি আগে অনেকবার দেখেছ। কোথাও কোনো তফাত বুঝতে পারছ?'

মেদিনী বলল—'খাটের ওপর বিছানা নেই।'

'তাছাড়া আর কিছু?'

মেদিনী চারিদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মাথা নাড়ল—'আর কোনো তফাত বুঝতে পারছি না।'

'হুঁ। আচ্ছা হয়েছে, এবার নীচে চল।'

মেদিনীকে নিয়ে রাখালবাবু নীচে নেমে গেলেন। মেদিনী নিজের ঘরে চলে গেল। রাখালবাবু ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করে দেখলেন ব্যোমকেশ একটা চেয়ারে অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে সিগারেট টানছে। দু'জনের চোখাচোখি হলো। ব্যোমকেশ বাঁকা হেসে ঊর্ধ্বদিকে ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর খাড়া হয়ে বসে বলল—'শুভকার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। রাখাল, এবার

আমি বাড়ি ফিরব। তোমার কতদূর ?'

রাখাল বললেন—'গঙ্গাধর ঘোষালকে দর্শন করবেন না ?'

'ওহো তাই তো, গঙ্গাধরকে দর্শন করা হলো না। আজ থাক, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, তিনি হয়তো ভূমানন্দে আছেন। কাল সকালে তাঁকে দর্শন করা যাবে।' ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়াল, পকেট থেকে নিখিলের চিঠিগুলি নিয়ে রাখালবাবুর হাতে দিয়ে বলল—'এগুলোতে মেয়েলি আঙুলের ছাপ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখো। আজ চলি।'

'চলুন, আমিও যাই। বর্ষাতিগুলো পরীক্ষা করতে হবে।'

পরদিন বেলা ন'টার সময় ব্যোমকেশ বেণীমাধবের বাড়িতে গিয়ে দেখল, রাখালবাবু সদর বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিখিল এবং সনতের সঙ্গে কথা বলছেন। ব্যোমকেশ যেতেই তিনি বললেন—'শুনেছেন ব্যোমকেশদা, মেদিনীর ঘর থেকে একটা বাক্স চুরি গেছে, টয়লেটের বাক্স।'

ব্যোমকেশ ভুরু উঁচু করে বলল—'টয়লেট-বক্স। সে কি, কি করে চুরি গেল ?'

'তা ঠিক বলতে পারছি না। তবে কাল সন্ধ্যেবেলা মেদিনীকে আমি তেতলায় ডেকেছিলাম, ওর ঘর খোলা ছিল, সেই সময় হয়তো কেউ সরিয়েছে। তাই এঁদের জিজ্ঞেস করছিলাম এঁরা কিছু জানেন কিনা।'

সনৎ বলল—'আমি কি করে জানব বলুন। মেদিনীর ঘরের মধ্যে কখনো পদার্পণ করিনি, কোথায় কী আছে কোত্থেকে জানব ?'

নিখিল বলল—'দোহাই দারোগাবাবু, আমি টয়লেট-বক্স চুরি করিনি। আমার ঘরে চুল বেঁধে টিপ পরার মানুষ নেই।'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে প্রশ্ন করল—'মকরন্দকে জেরা করেছিলে ?'

'করেছিলাম। তাদের ফ্ল্যাট আবার খানাতল্লাশ করেছিলাম, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না।'

'এঁদের ঘর ?'

'এইবার করব।' রাখালবাবু একজন জমাদারকে এবং সাব-ইন্সপেক্টরদের ডেকে বললেন—'তোমরা এঁদের ঘর দুটো আবার ভাল করে খানাতল্লাশ কর, মেদিনীর চুল বাঁধার বাক্সটা পাও কিনা দেখ। আমরা দোতলায় গঙ্গাধরবাবুর ফ্ল্যাটে যাচ্ছি।'

সনৎ অপ্রসন্ন মুখে বলল—'করুন করুন, যত ইচ্ছে খানাতল্লাশ করুন, কিন্তু আমার দামী ক্যামেরাগুলো ভাঙবেন না।'

ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু ওপরে উঠে গেলেন।

দোতলায় উঠে তাঁরা দেখলেন বারান্দার অপর প্রান্তে গঙ্গাধরের ফ্ল্যাটে সদর দরজা খুলে তার মেয়ে ঝিল্লী বেরিয়ে এল, দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দু'পা এসে তাদের দেখে সংকুচিতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাখালবাবু তার কাছে এসে ব্যোমকেশকে বললেন—'এর নাম ঝিল্লী, গঙ্গাধরবাবুর মেয়ে।—তুমি কোথায় যাচ্ছিলে ?'

ঝিল্লী সলজ্জ অস্ফুটস্বরে বলল—'মামীমা ডেকে পাঠিয়েছেন।'

ব্যোমকেশ ঝিল্লীর সংকোচনম্র কমনীয় মুখের পানে চেয়ে হাসল—'আমাদের দেখে এত লজ্জা কিসের ? আমরা বাঘ-ভাল্লুক নয়, কামড়ে দেব না।'

ঝিল্লী একটু হেসে চোখ তুলল। ব্যোমকেশ দেখল চোখ দুটি সুন্দর এবং বুদ্ধিদীপ্ত। রাখালবাবু পরিচয় দিলেন—'ইনিই ব্যোমকেশ বক্সী।'

ঝিল্লীর চোখে উৎসুক আলো ফুটে উঠল, তারপর আস্তে আস্তে তার মুখের ওপর অরুণাভা

ছড়িয়ে পড়ল। সে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করছে দেখে ব্যোমকেশ বলল—'ঝিল্লী, একটু দাঁড়াও, তোমার কাছে কিছু জানবার আছে।'

ঝিল্লী দাঁড়াল, কিন্তু ব্যোমকেশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রইল। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল—'লাবণির সঙ্গে তোমার খুব ভাব ছিল?'

একটু দ্বিধার পর ঝিল্লী ঘাড় নাড়ল।

'সে তোমাকে নিজের মনের কথা বলত, তুমি তাকে নিজের মনের কথা বলতে। কেমন?'

ঝিল্লী উত্তর দিল না, সতর্কভাবে অপেক্ষা করে রইল।

'লাবণি নিশ্চয় তোমাকে বলেছিল সে তার নাচের মাস্টার পরাগ লাহাকে ভালবাসে।'

ঝিল্লী ঘাড় নীচু করে অস্ফুটস্বরে বলল—'বলেছিল।'

'সে পালিয়ে গিয়ে পরাগকে বিয়ে করবে বলেছিল?'

ঝিল্লী উৎফুল্ল চোখ তুলল—'লাবণি ওকে বিয়ে করেছে!'

'হ্যাঁ। তুমি দেখছি জানতে না।'

'না।'

'কিন্তু জানতে পেরে খুব খুশি হয়েছ।'

ঝিল্লী হেসে ফেলল।

ঝিল্লীকে ছেড়ে গঙ্গাধরের দোরের দিকে যেতে যেতে রাখালবাবু খাটো গলায় বললেন—'আপনার মন বিচিত্র কুটিল পথে চলেছে, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি।'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসল। রাখালবাবু গঙ্গাধরের দোরে টোকা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে কড়া আওয়াজ এল—'কে? ভেতরে এসো।'

দু'জনে ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের মাঝখানে গোল টেবিল, তার সামনে চেয়ারে বসে গঙ্গাধর তাস নিয়ে সলিটেয়ার খেলছিল, রাখালবাবুর দিকে বিরক্ত চোখে চেয়ে বলল—'আবার কি চাই?'

গঙ্গাধরের ভাবভঙ্গী এখন অন্যরকম। নিজের টাকাকড়ি উড়িয়ে শ্বশুরের গলগ্রহ হবার পর সে কচ্ছপের মত হাত-পা গুটিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু শ্বশুরের মৃত্যুর পর হালের আইন অনুযায়ী সে অর্ধেক রাজত্ব পাবে এই অনিবার্য সম্ভাবনার ফলে সে আবার নিজ মূর্তি ধারণ করেছে, তার আচার-আচরণে বনেদী বড় মানুষের মজ্জাগত আত্মম্ভরিতা আবার ফুটে উঠেছে।

তার কথা বলার ভঙ্গীতে ব্যোমকেশের মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল, তারপর রাখালবাবু যখন বললেন—'ইনি আমার সহকারী শ্রীব্যোমকেশ বক্সী' তখন গঙ্গাধর উদ্ধতকণ্ঠে বলে উঠল—'তাতে কী হয়েছে? So what?'

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল, সে গঙ্গাধরের মুখোমুখি চেয়ারে বসে বলল—'আপনার নাম গঙ্গাধর ঘোষাল, কয়েক বছর আগে আপনি রেস-কোর্সের এক জকিকে ঘুষ খাওয়াবার চেষ্টা করার জন্যে আইনের হাতে পড়েছিলেন?'

গঙ্গাধর আরক্ত চোখে গর্জে উঠল—'তাতে আপনার কি?'

ব্যোমকেশ আঙুল তুলে বলল—'আপনি দাগী আসামী, আপনাকে খুনের সন্দেহে গ্রেপ্তার করা যায়। আপনার শ্বশুর উইল দস্তখত করার আগে রাত্রে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। কে তাঁকে খুন করেছে?'

বেগবান ঘোড়া হোঁচট লেগে যেন ডিগবাজি খেয়ে পড়ল। গঙ্গাধরের দম্ভস্ফীত মুখ তুবড়ে গেল, সে ভীতস্বরে বলল—'আমি কি জানি! আমি কি জানি!'

ব্যোমকেশ এবার একটু ঠাণ্ডা হলো, বলল—'বেণীমাধববাবুকে খুন করার স্বার্থ আপনারও আছে, অজয়বাবুরও আছে ; কিন্তু আপনি জামাতা, দশম গ্রহ।'

উত্তরে গঙ্গাধর দু'বার কথা বলবার জন্যে মুখ খুলল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। ব্যোমকেশ তখন সহজ সুরে বলল—'আপনার মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, বেশি তেজ দেখাবেন না।'

এই সময় গায়ত্রী ভিতর দিক থেকে ঘরে প্রবেশ করল। আঁচলটা কোমরে জড়ানো, চোখে তীব্র দৃষ্টি, যুদ্ধং দেহি ভাব। সে একটা চেয়ারে বসে ব্যোমকেশকে কড়া সুরে বলল—'কি জানতে চান আমাকে বলুন।'

ব্যোমকেশ গায়ত্রীকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল—'আপনি বেণীমাধববাবুর মেয়ে গায়ত্রী দেবী। আপনাকেও কিছু প্রশ্ন আছে।—আপনার বাবা উইল সই করবার আগেই কেউ তাঁকে খুন করেছে। কিন্তু তাঁর আগের কোনো উইল আছে কিনা আপনি জানেন ?'

এতক্ষণে গঙ্গাধর কতকটা ধাতস্থ হয়েছে, সে বলে উঠল—'আমার শ্বশুর ইন্‌টেস্‌টেট্ মারা গেছেন।'

গায়ত্রী অমনি ধমক দিয়ে উঠল—'তুমি চুপ করো।—আমার বাবার অন্য কোনো উইল নেই। তিনি যা রেখে গেছেন নতুন আইনের জোরে তার অর্ধেক আমি পাব।'

'বেণীমাধববাবু বিষয়ী লোক ছিলেন, এই বয়স পর্যন্ত তিনি উইল করেননি এ কি সম্ভব ? হয়তো পুরনো উইল বেরুবে, যাতে তিনি অন্য কাউকে যথাসর্বস্ব দিয়ে গেছেন। হয়তো আপনার জন্য মাসহারা বরাদ্দ করে বাকি সব টাকা অজয়বাবুকে দিয়ে গেছেন।'

ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে গায়ত্রী প্রায় চীৎকার করে উঠল—'না না না, বাবা কখনো আমাকে বঞ্চিত করবেন না। তিনি দাদার চেয়ে আমাকে ঢের বেশি ভালবাসতেন।'

'বসুন বসুন। আমি বলছি না যে, বেণীমাধববাবুর অন্য উইল আছেই। কিন্তু তিনি ভাগনেদেরও ভালবাসতেন, বাড়িতে এনে রেখেছিলেন ; তাদের কি কিছুই দিয়ে যাননি ?'

গায়ত্রী আবার চেয়ারে বসে বলল—'ওরা বাবার আসল ভাগনে নয়, মাসতুত বোনের ছেলে। সনতের বাপ দুশ্চরিত্র ছিল, স্ত্রীকে খুন করে ফাঁসি যায় ; নিখিলের বাপ সার্কাসের পেশাদার ক্লাউন ছিল। ওদের কেন বাবা টাকা দিয়ে যাবেন ?'

'আচ্ছা, ও কথা যাক। বলুন দেখি আপনার বাড়িতে ক'টা বর্ষাতি আছে।'

গায়ত্রী হঠাৎ যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল, কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—'দুটো আছে। একটা ওঁর, একটা ঝিল্লীর।'

'ও দুটো বার করে দিন, আমরা নিয়ে যাব।'

'নিয়ে যাবেন ! কেন ?'

'দরকার আছে। দু'চার দিন পরে ফেরত পাবেন।'

গায়ত্রী আবার কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ উঠে চলে গেল, বলল—'কি দরকার জানি না। এনে দিচ্ছি।'

নীচে নেমে এসে রাখালবাবু ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করলেন—'এবার ?'

ব্যোমকেশ বলল—'চল আমার বাড়ি। নিভৃতে পরামর্শ করা যাক। একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।'

'চলুন।'

বাড়িতে এসে ব্যোমকেশ চায়ের ফরমাস দিল। সত্যবতী চা এবং আলুর চপ রেখে গেল। অতঃপর পানাহার এবং সিগারেট সহযোগে পরামর্শ শুরু হলো।

এক ঘন্টা পরে রাখালবাবু বললেন—'বেশ, এই কথা রইল। পুলিস ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনার রাহা খরচ ইত্যাদি দেওয়া হবে, আমি তার ব্যবস্থা করব। আজ বিকেলে পাকা খবর পাবেন।'

রাখালবাবু চলে যাবার পর সত্যবতী ঘরে ঢুকল, ব্যোমকেশের চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসুক স্বরে বলল—'হ্যাঁ গা, কী তোমাদের এত ষড়যন্ত্র হচ্ছে?'

ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়িয়ে আলস্য ভাঙল।—'আমাকে বোধহয় কয়েক দিনের জন্যে বাইরে যেতে হবে।'

'কোথায় যাবে?'

'তা কি জানি!'

'তুমি জানো না তা কি কখনো হয়। নিশ্চয় জানো।'

ব্যোমকেশ সত্যবতীর কাঁধে হাত রেখে মৃদু হেসে বলল—'বেশ, জানি কিন্তু বলব না।'

সত্যবতী রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বিকেল চারটের সময় রাখালবাবুর ফোন এল—'সব ঠিক। আপনি একটা সুটকেস নিয়ে সটান থানায় চলে আসুন।'

ব্যোমকেশের অনুপস্থিতিকালে বেণীমাধবের বাড়ির কর্মসূচী আগের মতই বলবৎ রইল। কারুর বাইরে যাবার হুকুম নেই। একজন সাব-ইন্সপেক্টর, একজন জমাদার এবং চারজন কনস্টেবল হামেহাল মোতায়েন রইল। রাখালবাবু দু'বেলা এসে পরিদর্শন করে যেতে লাগলেন। বেণীমাধবের মৃত্যু সম্বন্ধে নতুন কোনো তথ্য আবিষ্কৃত হলো না। মেদিনীর সাজের বাক্সটা অদৃশ্য হয়েছিল, অদৃশ্যই রয়ে গেল।

একদিন লাবণি তার স্বামীকে নিয়ে বাপ-মা'র সঙ্গে দেখা করতে এল। রাখালবাবু তাদের দেখা করতে দিলেন। বন্ধ দরজার অন্তরালে অজয়-পরিবার কীভাবে মেয়ে-জামাইয়ের সংবর্ধনা করল তা জানা গেল না। লাবণিরা যখন বেরিয়ে এল তখন লাবণির মুখে হাসি চোখে জল। বারান্দায় ঝিল্লীর সঙ্গে লাবণির দেখা হলো; দুই বোন পরস্পর গলা জড়িয়ে চুমু খেল, তারপর হাত ধরাধরি করে নীচে নেমে এল। নীচের বারান্দায় নিখিল ছিল, সে নব দম্পতিকে দেখে হো হো করে হেসে বলল—'এই যে পলাতক আর পলাতকা! দু'জনে মিলে খুব নাচছ তো?'

পরাগ কপট বিষণ্ণতায় ম্রিয়মাণ মুখভঙ্গী করে বলল—'দু'জনে মিলে নাচা আর হচ্ছে কই? এখন আমি নাচছি, লাবণি নাচাচ্ছে।'

লাবণিরা চলে যাবার পর নিখিল ঝিল্লীকে বলল—'কী, তুমি আর দেরি করছ কেন? একজন তো নাচিয়েকে নিয়ে কেটে পড়ল, এবার তুমি একটা গাইয়েকে নিয়ে কেটে পড়।'

ঝিল্লী ভুরু বেঁকিয়ে নিখিলের পানে তাকাল—'আমি কেটে পড়ব না। কিন্তু তোমার খবর কি? যে তোমাকে চিঠি লেখে তাকে ধরতে পারলে?'

নিখিল বলল—'ধরিনি এখনো কিন্তু আর বেশি দেরি নেই। ব্যোমকেশবাবু বলেছেন শীগ্‌গির ধরে দেবেন। যেই ধরব অমনি পটাস করে বিয়ে করে ফেলব। আমার সঙ্গে চালাকি নয়।'

'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।' মুচকি হেসে ঝিল্লী ওপরে চলে গেল।

পাঁচ দিন পরে ব্যোমকেশ ফিরে এল, তার সঙ্গে একটি মানুষ। নিম্নশ্রেণীর পশ্চিমা

যুবক। ব্যোমকেশ যুবককে নিয়ে সোজা থানায় উপস্থিত হলো, রাখালবাবুর সঙ্গে কথা বলল। তারপর যুবককে রাখালবাবুর জিম্মায় রেখে বাড়ি গেল। রাখালবাবুকে বলে গেল—'আজ বিকেল চারটের সময় বেণীমাধবের ড্রয়িংরুমে থিয়েটার বসবে, তুমি হবে তার স্টেজ ম্যানেজার।'

বিকেল চারটের সময় ব্যোমকেশ বেণীমাধবের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখল, ড্রয়িংরুমে বাড়ির ন'জন লোক উপস্থিত আছে; অজয় আরতি মকরন্দ একটা সোফায় বসেছে, অন্য সোফায় বসেছে গঙ্গাধর গায়ত্রী আর ঝিল্লী। সনৎ আর নিখিল দুটো চেয়ারে দূরে দূরে বসেছে; আর মেদিনী মেঝের ওপর দেয়ালে ঠেস দিয়ে উদাসভাবে বসে আছে। সকলের মুখেই বিরক্তি ও অবসাদের ব্যঞ্জনা। ড্রয়িংরুমের দোরে ও বারান্দায় পুলিস গিজগিজ করছে। রাখালবাবু একটা ছোট সুটকেস হাতে নিয়ে অধীরভাবে বারান্দায় পায়চারি করছেন।

ব্যোমকেশ পৌঁছুতেই রাখালবাবু তাকে বললেন—'সব তৈরি, এবার তবে আরম্ভ করা যাক।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল—'হিম্মৎলাল ?'

রাখালবাবু বললেন—'তাকে লুকিয়ে রেখেছি। যথাসময়ে সে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবে।'

'বেশ, এসো তাহলে। তোমার হাতে ওটা— ? ও বুঝেছি।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলেন। সকলে নড়েচড়ে বসল, মকরন্দর মুখের ভ্রূকুটি গভীরতর হলো। রাখালবাবু মাঝখানের নীচু টেবিলটাকে এক পাশে টেনে এনে দুটো হাল্কা চেয়ার তার সামনে রাখলেন; হাতের সুটকেস টেবিলের ওপর রেখে ব্যোমকেশকে বললেন—'বসুন।' নিজে সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ব্যোমকেশ হাসিমুখে একবার সকলের মুখের দিকে তাকাল, বলল—'আপনারা শুনে সুখী হবেন বেণীমাধববাবুর হত্যাকারী কে তা আমরা জানতে পেরেছি, আততায়ীর বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণও পেয়েছি। আসামী এই ঘরেই আছে, এখনি তার পরিচয় পাবেন।'

সকলে সন্দেহভরা চোখে পরস্পর তাকাতে লাগল; বেশি দৃষ্টি পড়ল গঙ্গাধরের ওপর। ব্যোমকেশ শান্ত স্বরে বলে চলল—'আমরা গোড়াতেই একটা ভুল করেছিলাম, ভেবেছিলাম বেণীমাধববাবুই আসামীর প্রধান লক্ষ্য। ভুলটা অস্বাভাবিক নয়; বেণীমাধববাবু বড় মানুষ ছিলেন, তিনি এমন উইল করতে যাচ্ছিলেন যাতে তাঁর উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা ছিল; মেঘরাজ ছিল বেণীমাধবের দ্বাররক্ষী, বেণীমাধবকে যে ব্যক্তি মারতে চায় সে মেঘরাজকে না মেরে ঘরে ঢুকতে পারবে না তাই তাকে মেরেছে। মেঘরাজের মত লোক যে হত্যাকারীর প্রধান লক্ষ্য হতে পারে তা ভাবাই যায় না।

'আমি একদিন বেণীমাধববাবুর ঘরে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলাম তাঁর ক্ষুর রয়েছে; সাবেক কালের লম্বা ক্ষুর, যে-ক্ষুর দিয়ে মেঘরাজ তাঁর দাড়ি কামিয়ে দিত। ক্ষুরটা খাপ থেকে বের করে পরীক্ষা করলাম, তাতে কোথাও একটিও আঙুলের ছাপ নেই; কে যেন খুব সাবধানে ক্ষুরটি মুছে খাপের মধ্যে রেখেছে। কিন্তু কেন ? স্বাভাবিক অবস্থায় অন্তত মেঘরাজের আঙুলের ছাপ তাতে থাকা উচিত।

'সন্দেহ হলো। সেই ক্ষুর দিয়ে আমি নিজে দাড়ি কামাতে গিয়ে দেখলাম ক্ষুর একেবারে ভোঁতা, তা দিয়ে দাড়ি কামানো দূরের কথা, পেন্সিল কাটাও যায় না। তখন আর সন্দেহ রইল না যে, এই ক্ষুর দিয়েই দু'জন লোকের গলা কাটা হয়েছে এবং তার ফলেই ক্ষুরটি ভোঁতা হয়ে গেছে। ডাক্তারি পরীক্ষাতেও প্রমাণ হলো যে, ওই ক্ষুর দিয়েই দু'জনের গলা কাটা হয়েছিল।

'কিন্তু ক্ষুর ছিল ঘরের মধ্যে, আসামী এসেছিল বাইরে থেকে ; ঘরে ঢোকবার আগেই সে ক্ষুর পেল কোথা থেকে ? নিশ্চয় কেউ ক্ষুরটি আগেই ঘর থেকে সরিয়েছিল।

'কে সরাতে পারে ? সেদিন সকালে মেঘরাজ ওই ক্ষুর দিয়ে বেণীমাধবের দাড়ি কামিয়ে দিয়েছিল ; তারপর সারা দিনে তাঁর ঘরে যারা এসেছিল তারা কেউ ক্ষুরের কাছে যায়নি।' ও ঘরে নিত্য আসে যায় কেবল দু'জন : মেঘরাজ ও মেদিনী। মেঘরাজ নিজের গলা কাটবার জন্যে ক্ষুর চুরি করবে না। তাহলে বাকি রইল কে ?'

সকলের দৃষ্টি মেদিনীর ওপর গিয়ে পড়ল। মেদিনী দেয়ালে ঠেস দিয়ে আগের মতই বসে আছে, মাথার ওপরকার আঁচলটা দু' হাতে একটু তুলে ধরে নির্নিমেষ চোখে ব্যোমকেশের পানে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ সনৎ কথা বলল—'একটা কথা বুঝতে পারছি না। হত্যাকারী মামার ক্ষুর দিয়ে গলা কাটতে গেল কেন ? অন্য অস্ত্র কি ছিল না ?'

ব্যোমকেশ বলল—'আসামী লোকটা ভারি ধূর্ত। সে জানে যে-অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয় সে-অস্ত্রকে বেবাক লোপাট করে দেওয়া সহজ নয়। তাই সে মতলব করেছিল, বেণীমাধবের ক্ষুর দিয়ে গলা কাটবার পর ক্ষুরটি ভাল করে মুছে যথাস্থানে রেখে দেবে, ওই ক্ষুর দিয়ে যে খুন হয়েছে একথা কারুর মনেই আসবে না, পুলিস অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াবে। বুঝতে পেরেছেন ?'

'পেরেছি। এবার আপনার বক্তৃতা শেষ করুন।'

ব্যোমকেশ আবার নির্লিপ্ত স্বরে বলতে আরম্ভ করল—'মেদিনী ছোট ঘরের মেয়ে, কিন্তু পুরুষের চোখ দিয়ে যারা ওর পানে তাকিয়েছে তারাই জানে কী প্রচণ্ড ওর দেহের চৌম্বক শক্তি। সে সুচরিত্রা মেয়ে কিনা তা আমরা জানি না। যদি কুচরিত্রা হয় তাহলে মনে রাখতে হবে যে, মেঘরাজ ও বৃদ্ধ বেণীমাধব ছাড়া বাড়িতে আরো পাঁচজন সমর্থ পুরুষ আছে। স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ আসক্তির ফলে অসংখ্য ট্র্যাজেডি ঘটেছে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

'আমরা মেদিনীর ঘরে গিয়ে তাকে জেরা করেছিলাম ; মেঘরাজের সৈনিক জীবনের দলিলপত্র থেকে তার দিল্লীর ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। তারপর একটা অপ্রত্যাশিত জিনিস পেলাম। মেদিনীর একটি চুল-বাঁধার কাঠের বাক্স ছিল, তার ডালা খুলে দেখলাম আয়নার ওপর একটা ফটো আঁটা রয়েছে। মেদিনীর ফটো, সাম্প্রতিক ছবি। সে খাটের ধারে বসে হাসছে। আমি আবার বাক্সের ডালা বন্ধ করে দিলাম, মেদিনী কিছু জানতে পারল না। পরদিন শুনলাম বাক্সটা চুরি গিয়েছে।' ব্যোমকেশ ঘাড় তুলে রাখালবাবুর পানে চাইল।

রাখালবাবু টেবিলের ওপরে সুটকেসটা খুলতে খুলতে অবিচলিত মুখে বললেন—'চুরি গিয়েছিল, আমরা খুঁজে বার করেছি।' তিনি সুটকেস থেকে প্রসাধনের বাক্সটা বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন।

ব্যোমকেশ বলল—'ছবিটা আছে নিশ্চয়।'

রাখালবাবু ডালা খুলে বললেন—'আছে।' কে চুরি করেছিল, কোথায় পাওয়া গেল এ সম্বন্ধে তিনি নীরব রইলেন। মনে হয়—চুরির ব্যাপারটা নিছক ধোঁকার টাটি।

ব্যোমকেশ বলল—'বেশ। তারপর আমরা বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে একে একে দেখা করলাম। বাড়িতে যতগুলো বর্ষাতি ছিল সংগ্রহ করলাম ; কেবল মকরন্দর বর্ষাতি পাওয়া গেল না। মকরন্দ সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখা দরকার—বেণীমাধবের হুকুমে মেঘরাজ তার গালে চড় মেরেছিল ; অর্থাৎ দু'জনেরই ওপর তার গভীর আক্রোশ। সে-রাত্রে ন'টার সময় সে বাড়িতে এসেছিল, তারপর গভীর রাত্রে কখন চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল

কেউ জানে না। সে যখন রেস-কোর্সে ধরা পড়ল তখন তার পকেটে পৌনে দুশো টাকা ছিল। কোথা থেকে সে এত টাকা পেল তা বলতে চায় না।

'যাহোক, বর্ষাতি কেন সংগ্রহ করলাম সেই কথা বলি। যারা মতলব এঁটে ঘুমন্ত লোকের গলা কাটতে যায় তারা জানে এই উপায়ে নিঃশব্দে খুন করা যায় বটে, কিন্তু আততায়ীর নিজের কাপড়-চোপড়ে প্রচুর রক্ত লাগার সম্ভাবনা। কাপড়-চোপড়ে রক্ত লাগলে সহজে ধোয়া যায় না, রক্তের দাগ থেকে যায়। তাই পাশ্চাত্ত্য দেশে খুন করবার সময় খুনী গায়ে বর্ষাতি চড়িয়ে নেয়; বর্ষাতির তেলা গায়ে যেটুকু রক্ত লাগে তা সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়। পাশ্চাত্ত্য রহস্য রোমাঞ্চের বই যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই একথা জানেন। আমরা বর্ষাতিগুলোকে মালিকের নামের টিকিট মেরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যে ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দিলাম।

'তারপর আমি গেলাম দিল্লী। এতক্ষণে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম আসামী কে, কিন্তু আরো পাকা প্রামাণের দরকার ছিল। দিল্লীতে গিয়ে যে-বস্তিতে মেঘরাজ থাকত, সেখানে খোঁজখবর নিতেই অনেক কথা বেরিয়ে পড়ল। মেদিনী মেঘরাজের স্ত্রী নয়। মেঘরাজ বিপত্নীক ছিল; বেণীমাধব যখন তাকে বললেন, স্ত্রীকে নিয়ে এসো, তখন সে দিল্লী গিয়ে মেদিনীকে স্ত্রী সাজিয়ে নিয়ে এল। মেদিনীর স্বামী আছে, কিন্তু তার চরিত্র ভাল নয়; মেঘরাজের সঙ্গে আগে থাকতেই তার ঘনিষ্ঠতা ছিল; সে মেঘরাজের সঙ্গে পালিয়ে এল। বুঝে দেখুন মেদিনী কি রকম মেয়েমানুষ।'

মেদিনীর চোখ আতঙ্কে ভরে উঠেছিল, সে হঠাৎ চীৎকার করে উঠল—'না না, ঝুট বাত।'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুর পানে চোখ তুলল, তিনি দোরের দিকে চেয়ে হাঁক দিলেন—'হিম্মৎলাল!'

যে পশ্চিমা যুবককে ব্যোমকেশ দিল্লী থেকে সঙ্গে এনেছিল সে ঘরে প্রবেশ করল; চুড়িদার পায়জামা ও শেরোয়ানি পরা ক্ষীণকায় যুবক। ব্যোমকেশ তার দিকে আঙুল দেখিয়ে মেদিনীকে জিজ্ঞেস করল—'একে চিনতে পার?'

মেদিনী তড়িৎপৃষ্টের মত উঠে দাঁড়িয়েছিল, ভয়ার্ত চোখে হিম্মৎলালের দিকে একবার চেয়ে আবার মাটিতে আছড়ে পড়ল, মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

'হিম্মৎলাল, মেদিনী তোমার কে?'

'জি, মেদিনী আমার বিয়াহী ঔরৎ, আমাকে ছেড়ে মেঘরাজের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল।'

'আচ্ছা, তুমি এখন বাইরে যাও।'

হিম্মৎলাল মেদিনীর পানে বিষদৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল—'দেখা যাচ্ছে মেদিনীই যত নষ্টের গোড়া। সে স্বামীকে ছেড়ে মেঘরাজের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল, তারপর এখানে এসে আর একজন উচ্চতর বর্গের মানুষকে তার মোহময় কুহকজালে জড়িয়ে ফেলল। কিন্তু মেঘরাজ কড়া প্রকৃতির লোক, সে জানতে পারলে মেদিনীর উচ্চাশা ধূলিসাৎ হবে; তাই তাকে সরানো দরকার হয়ে পড়ল। কিন্তু একলা মেঘরাজকে খুন করলে ধরা পড়ার ভয় আছে, তাই মেঘরাজের সঙ্গে বেণীমাধবকেও খুন করে পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। বেণীমাধবের সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়েদের বিরোধ যে বেশ ঘনিয়ে উঠেছে তা মেদিনীর অজানা ছিল না।

'কিন্তু সত্যিই কি মেদিনী নিজের হাতে দু'জনের গলা কেটেছে? ছোরা ছুরি ক্ষুর মেয়েদের অস্ত্র নয়, মেয়েদের অস্ত্র বিষ; বিষ খাওয়াবার সুযোগ থাকলে তারা ছোরা ছুরি ব্যবহার করে

না। মেদিনীর বিষ খাওয়াবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, সে বেণীমাধব ও মেঘরাজের খাবার নিজের হাতে রান্না করত।

'দেখা যাক, মেদিনীর সহকারী কে?—মেদিনী, তোমার চুল বাঁধার বাক্সে আয়নার গায়ে একটা ফটো লাগানো আছে। কে ফটো তুলেছিল?'

মেদিনী উত্তর দিল না, মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। ব্যোমকেশ তখন সনতের দিকে ফিরে বলল—'সনৎবাবু, আপনি ফটোগ্রাফির বিশেষজ্ঞ, দেখুন তো একবার ছবিটা।'

সনৎ ব্যোমকেশের পানে সন্দেহভরা ভ্রূকুটি করল, তারপর অনিচ্ছাভরে উঠে এল। রাখালবাবু বাক্সের ডালা খুলে ধরলেন। সনৎ সামনে ঝুঁকে ছবিটা দেখল; তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। সে অবরুদ্ধ স্বরে বলল—'মেদিনীর ছবি।'

ব্যোমকেশ বলল—'কে ছবি তুলেছে বলতে পারেন?'

'তা কি করে বলব!'

'ভাল করে দেখুন। মেদিনীকে খাটে বসিয়ে ছবি তোলা হয়েছে, মেদিনীর পেছনে খাটের মাথায় কারুকার্য দেখা যাচ্ছে। কার খাট চিনতে পারছেন না?'

সনতের চোখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—'কি বলতে চান আপনি?'

ব্যোমকেশ বলল—'আপনি নিজের ঘরে রাত্তির বেলা ফ্ল্যাশ-লাইট দিয়ে মেদিনীর ছবি তুলেছিলেন। আপনি মেদিনীর গুপ্ত-প্রণয়ী। মেঘরাজ যখন বেণীমাধবের দোরের সামনে শুয়ে ঘুমোত তখন মেদিনী আপনার ঘরে যেত।'

সনৎ কিছুক্ষণ জবাফুলের মত লাল চোখে চেয়ে রইল, শেষে বিকৃত গলায় বলল—'তাতে কি প্রমাণ হয় আমি মামকে খুন করেছি?'

'সনৎবাবু, আপনি মেদিনীর মোহে পড়ে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়েছিলেন, মেঘরাজকে খুন করে মেদিনীর ওপর একাধিপত্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। আপনার বোধহয় প্ল্যান ছিল খুনের মামলা মিটে গেলে মেদিনীকে নিয়ে অন্য কোথাও বাসা বাঁধবেন।'

'আমি খুন করিনি।'

'আপনার দেহে খুনীর রক্ত আছে, আপনার বাবা আপনার মাকে খুন করে ফাঁসি গিয়েছিলেন।'

'আমি খুন করিনি। খুন করেছে—ওই মেদিনী।'

মেদিনী ধড়মড়িয়ে হাঁটুর ওপর উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল—'নেহি নেহি নেহি—'

ব্যোমকেশ বলল—'ঠিক কথা। মেদিনী নিজের হাতে খুন করেনি। খুন করেছেন আপনি।'

'প্রমাণ আছে?'

'ছোট্ট একটা প্রমাণ আছে। খুন করার পর আপনি বর্ষাতিটাকে খুব ভাল করেই ধুয়েছিলেন, কিন্তু পকেটের মধ্যে কয়েক ফোঁটা রক্ত রয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, রক্তটা বেণীমাধববাবুর ব্লাড-গ্রুপের রক্ত।'

মেদিনী বলে উঠল—'হাঁ হাঁ, সনৎবাবু খুন করেছে, আমি কিছু জানি না, আমি বে-কসুর।'

হঠাৎ সনৎ বুনো মোষের মত ঘাড় নীচু করে চাপা গর্জন করতে করতে মেদিনীর দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর ইতিমধ্যে সনতের দু'পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা সনতকে ধরে ফেললেন। রাখালবাবু তার হাতে হাতকড়া পরালেন। সনতের ক্ষিপ্র উন্মত্ততা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দুই প্রহরীর মাঝখানে সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে

গেল।

মেদিনী আবার বলে উঠল—'আমি কিছু জানি না, আমি বে-কসুর।'

ব্যোমকেশ মাথা নেড়ে বলল—'না মেদিনী, তুমি বে-কসুর নও। বেণীমাধববাবুর ক্ষুর চুরি করে তুমিই সনৎবাবুকে দিয়েছিলে। তারপর সে যখন গভীর রাত্রে ফিরে এসে সদর দোরে টোকা দিয়েছিল তখন তুমি দোর খুলে তাকে ভিতরে এনেছিলে ; সে কাজ সেরে চলে যাবার পর তুমি দোর বন্ধ করে দিয়েছিলে। তোমরা দু'জন সমান অপরাধী।'

মেদিনী আবার মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। আসামী দু'জনকে চালান করে দিয়ে রাখালবাবু বাড়ির ওপর থেকে অবরোধ তুলে নিয়েছেন। বাইরে ঘনায়মান সন্ধ্যা। রাখালবাবু সনতের ঘরে গিয়ে তার আলমারি খুলে অ্যালবামের সারি থেকে একটি একটি অ্যালবাম খুলে পাতা উল্টে দেখছিলেন। ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানতে টানতে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

রাখালবাবু অবশেষে একটি অ্যালবাম হাতে নিয়ে টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন, নিবিষ্ট মনে অ্যালবামের ছবিগুলি দেখতে লাগলেন। প্রতি পৃষ্ঠায় একটি শিথিলবসনা তরুণীর ছবি। শিকারী যেমন বাঘ শিকার করে তার চামড়া দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে, সনৎ যেন প্রকারান্তরে তাই করেছে।

অ্যালবাম শেষ করে রাখালবাবু একটি নিশ্বাস ফেললেন, সিগারেট ধরিয়ে বললেন—'সনৎ গাঙ্গুলির রক্তে পাগলামির বীজ আছে, কিন্তু সে যে একটি রসিক চূড়ামণি তাতে সন্দেহ নেই।'

ব্যোমকেশ কাছে এসে অ্যালবামের পাতা উলটে দেখল, তারপর বলল—'শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বলেছেন, নারী নরকের দ্বার। সনৎ নরকের অনেকগুলো দ্বার খুলেছিল, তাই শেষ পর্যন্ত তার নরক-প্রবেশ অনিবার্য হয়ে পড়ল।'

'কিন্তু সনৎ মেদিনীর মত মেয়ের জন্য এমন ভয়ঙ্কর কাজ করল ভাবতে আশ্চর্য লাগে।'

'রাখাল, মেদিনীর মত মেয়েকে তুচ্ছজ্ঞান কোরো না। যুগে যুগে এই জাতের মেয়েরা জন্মগ্রহণ করেছে—কখনো ধনীর ঘরে কখনো দরিদ্রের ঘরে—পুরুষের সর্বনাশ করার জন্যে। দ্রৌপদী এই জাতের মহিলা ছিলেন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূলে আছে দ্রৌপদী। ইলিয়ডের হেলেনও তাই। এ যুগেও এই জাতের মেয়ের অভাব নেই। ওরা সকলেই যে চরিত্রহীনা তা নয়, কিন্তু ওদের এমন একটা কিছু আছে যা পুরুষকে—বিশেষত সনতের মত দুশ্চরিত্র পুরুষকে—ক্ষেপিয়ে দিতে পারে, কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মত্ত করে তুলতে পারে। জ্যেষ্ঠ আলেকজান্ডার দুমা একটা বড় দামী কথা বলেছিলেন—cherchez la femme: যেখানে এই ধরনের ব্যাপার ঘটে সেখানে মেয়েমানুষ খুঁজবে, মূলে মেয়েমানুষ আছে।'

'তা বটে।' রাখালবাবু উঠলেন—'দেখা যাচ্ছে বেণীমাধবের মেয়ে এবং পুত্রবধূ তাঁকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করেনি, বৃদ্ধের জীর্ণ পাকযন্ত্রই দায়ী।—চলুন, এবার যাওয়া যাক। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এক পেয়ালা গরম চায়ের জন্যে প্রাণ কাঁদছে।'

'চল আমার বাড়িতে, তরিবৎ করে চা খাওয়া যাবে।'

'উত্তম প্রস্তাব।'

ঘরের বাইরে এসে রাখালবাবু দোরে তালা লাগালেন, তারপর সদর দরজার দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন ঝিল্লী সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে, তার পিছনে প্রকাণ্ড ট্রে'র ওপর চায়ের সরঞ্জাম এবং কচুরি-নিমকির প্লেট নিয়ে দাসী আসছে। ব্যোমকেশ বলল—'রাখাল, তোমার প্রাণের কান্না ভগবান শুনতে পেয়েছেন। চল, ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসা

যাক।'

রাখালবাবু সাবধানী লোক, বললেন—'দাঁড়ান, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।'

ঝিল্লী তাদের কাছে এসে সলজ্জ স্বরে বলল—'মা আপনাদের জন্যে চা জলখাবার পাঠিয়ে দিলেন।'

'দেখলে তো?' সকলে ড্রয়িংরুমে গেল। ঝি টেবিলের ওপর ট্রে রেখে চলে গেল; ঝিল্লীও তার অনুগমন করছিল, ব্যোমকেশ বলল—'ঝিল্লী, আমরা বড় ক্লান্ত; তুমি আমাদের চা ঢেলে দাও, আমরা বসে বসে খাই।'

ঝিল্লী ফিরে এসে টি-পট থেকে তাদের চা ঢেলে দিল, জলখাবারের প্লেট তাদের সামনে রাখল। ব্যোমকেশ অর্ধমুদিত চোখে কচুরি চিবোতে চিবোতে দেখল, ঝিল্লী গুটি গুটি দোরের দিকে যাচ্ছে।

'ঝিল্লী, শোনো, চলে যেও না। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

ঝিল্লী থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর আস্তে আস্তে ফিরে এসে ব্যোমকেশের পাশে দাঁড়াল। ব্যোমকেশ সংকেতভরা চোখে রাখালবাবুর পানে তাকাল; রাখালবাবু অলসভাবে চায়ের পেয়ালা শেষ করে একটি গানের কলি গুঞ্জন করতে করতে ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

ঝিল্লী ব্যোমকেশের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তার যে বুক ঢিবঢিব করছে তা তার মুখ দেখে বোঝা যায় না। ব্যোমকেশ খাটো গলায় একটু হাসল, বলল—'সম্পর্কে নিখিল তোমার মামা হয় বটে, কিন্তু অনেক দূরের সম্পর্ক। আইনত বিয়ে আটকায় না।'

ঘরের ছায়া-ছায়া অন্ধকারে দেখা গেল না—ঝিল্লীর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। তারপর তার ক্ষীণস্বর শোনা গেল—'কি করে জানলেন?'

ব্যোমকেশ বলল—'বোকা মেয়ে! সবগুলো চিঠিতেই তোমার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।—আচ্ছা, তুমি এখন কোণের চেয়ারে গিয়ে বোসো। আরো কথা আছে।'

ঝিল্লী নেংটি ইঁদুরের মত ঘরের অন্ধকার কোণে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘরে যেন ব্যোমকেশ ছাড়া আর কেউ নেই।

বাইরে দু'জোড়া জুতোর শব্দ শোনা গেল। রাখালবাবু নিখিলকে নিয়ে ফিরে এলেন।

'রাখাল, আলোটা জ্বেলে দাও।'

দোরের পাশে সুইচ। রাখালবাবু সুইচ টিপলেন, কয়েকটা উজ্জ্বল বাল্‌ব জ্বলে উঠল। নিখিল কোনোদিকে না তাকিয়ে ব্যোমকেশের পাশে গিয়ে বসল, অনুরাগপূর্ণ চোখে তার পানে চেয়ে বলল—'ব্যোমকেশদা, আপনি ভেলকি জানেন। সনৎদা আমার মাসতুত ভাই, তাকে সারা জীবন দেখছি, কিন্তু সে যে এমন মানুষ তা ভাবতেও পারিনি।'

ব্যোমকেশ বলল—'নিখিল, মুখ দেখে যদি মানুষের মনের কথা জানা যেত, তাহলে আইন, আদালত, পুলিস, সত্যান্বেষী কিছুই দরকার হতো না; তুমিও মুখ দেখেই বুঝতে পারতে কোন্ মেয়েটি তোমাকে বেনামী চিঠি লেখে।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।' নিখিল ব্যোমকেশের আর একটু কাছে ঘেঁষে বসল, ষড়যন্ত্রকারীর মত ফিসফিস করে বলল—'আপনি কিছু বুঝতে পেরেছেন নাকি?'

ব্যোমকেশ হাসল—'আগে তুমি বলো দেখি মেয়েটির সন্ধান যদি পাওয়া যায় তুমি কি করবে?'

নিখিলের চোখ উদ্দীপনায় জ্বলজ্বল করে উঠল—'কী করব? বিয়ে করব। কানা হোক, খোঁড়া হোক, কাফ্রি হোক, হাবসি হোক, তাকে বিয়ে করব।'

ব্যোমকেশ বলল—'তাহলে সন্ধান পাওয়া গেছে। —ঝিল্লী, এদিকে এসো।'

নিখিল চকিত হয়ে দোরের দিকে চাইল। ওদিকে ঘরের কোণে ঝিল্লীর সাড়াশব্দ নেই, সে চেয়ারের পিছনে লুকিয়েছে। নিখিল ব্যোমকেশের দিকে ফিরে উত্তেজিত স্বরে বলল—'কাকে ডাকলেন?'

'এই যে দেখাচ্ছি—' ব্যোমকেশ উঠে গিয়ে ঝিল্লীর হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল, তাকে হাত ধরে নিখিলের কাছে এনে বলল—'এই নাও তোমার ঝিঁঝিঁ পোকা। ঝিঁঝিঁ পোকাকে চোখে দেখা যায় না, কেবল ঝংকার শোনা যায়। আমরা কিন্তু ধরেছি।'

নিখিলের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম করল। সে দু' হাত তুলে চীৎকার করল—'অ্যাঁ! ঝিল্লী—ঝিল্লী আমাকে চিঠি লেখে! ঝিল্লী আমাকে ভালবাসে! কিন্তু—কিন্তু ও যে আমার ভাগনী!'

ব্যোমকেশ হেসে বলল—'ভয় নেই, ভয় নেই। ঝিল্লী ভারি সেয়ানা মেয়ে, অপাত্রে হৃদয় সমর্পণ করেনি। তোমাদের যা সম্পর্কে তাতে বিয়ে আটকায় না।'

ঝিল্লীর মুখ অবনত, ঠোঁটের কোণে ভীরু হাসির যাতায়াত। নিখিলের মুখে ক্রমে ক্রমে একটি প্রকাণ্ড হাসি ফুটে উঠল, সে বলল—'উঃ, কী সাংঘাতিক আজকালকার মেয়ে দেখেছেন ব্যোমকেশদা, আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছিল। আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। বিয়েটা হয়ে যাক—'

এই সময় দোরের সামনে গঙ্গাধরকে দেখা গেল। লাঠি হাতে সে বোধহয় সায়াহ্নিক নিত্যকর্ম করতে বেরুচ্ছিল। ঘরের মধ্যে গলার আওয়াজ শুনে ঘরে ঢুকেছে। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মেজাজ আবার সপ্তমে চড়ে গিয়েছে, সে রাখালবাবুকে লক্ষ্য করে কড়া সুরে বলল—'এখানে আপনার কাজ শেষ হয়েছে, এখনো এখানে রয়েছেন কেন?' রাখালবাবু উত্তর দেবার আগেই তার চোখ পড়ল ঝিল্লীর ওপর, অমনি ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি করে সে বলল—'ঝিল্লী! তুই এখানে পুরুষদের মধ্যে কি করছিস?'

বাপকে দেখে ঝিল্লী একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, এখন চমকে উঠে ব্যোমকেশের পিছনে লুকোবার চেষ্টা করল। গঙ্গাধর বলল—'ধিঙ্গি মেয়ে! পুরুষ-ঘেঁষা স্বভাব হয়েছে। চাবকে লাল করে দেব।'

নিখিল হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল, এক লাফে গঙ্গাধরের সামনে গিয়ে বলল—'মুখ সামলে কথা বলুন। ঝিল্লীকে আমি বিয়ে করব।'

গঙ্গাধর প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল, তারপর তারস্বরে চিক্কুর ছাড়ল—'কী, আমার মেয়েকে বিয়ে করবি তুই, হতভাগা ছাপাখানার ভূত! ঠেঙিয়ে তোর হাড় ভেঙে দেব না!' সে লাঠি আস্ফালন করতে লাগল।

এইবার গায়ত্রী ঘরে ঢুকল, উগ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে বলল—'কি হয়েছে, এত চেঁচামেচি কিসের?'

গঙ্গাধর কর্ণপাত করল না, চেঁচিয়ে বলল—'বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। ছোট মুখে বড় কথা। আমার মেয়েকে তুই বিয়ে করবি!'

ঝিল্লী ছুটে গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল, কানে কানে বলল—'মা, তুমি যদি অমত কর আমি বিষ খেয়ে মরব।' চরম অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ঝিল্লীর মুখে কথা ফুটেছে।

গায়ত্রী একবার নিখিলকে ভাল করে দেখল, যেন আগে কখনো দেখেনি। নিখিল গিয়ে তার পায়ের ধুলো নিল। বলল—'দিদি, ঝিল্লীকে আমি—মানে আমাকে ঝিল্লী বিয়ে করতে চায়। ব্যোমকেশদা বলেছেন সম্পর্কে বাধে না।'

গায়ত্রী ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করল—'সত্যি সম্পর্কে বাধে না ?'

ব্যোমকেশ বলল—'না, ওরা first cousin নয়, সম্পর্কে বাধে না।'

গঙ্গাধর আরো গলা চড়িয়ে চীৎকার করল—'শুনতে চাই না, কোনো কথা শুনতে চাই না। বেরিয়ে যাও তোমরা আমার বাড়ি থেকে, এই দণ্ডে বেরিয়ে যাও—'

গায়ত্রী ধমক দিয়ে উঠল—'থামো তুমি। বাড়ি তোমার নয়, বাড়ি আমার। আমি সুধাংশুবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি ; বাবা উইল করার আগেই মারা গেছেন, আইনত তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক আমার, এ বাড়িরও অর্ধেক আমার।—তুমি বাইরে যেখানে যাচ্ছিলে যাও না। যা করার আমি করব।'

গঙ্গাধর পিন ফোটানো খেলনার বেলুনের মত চুপসে গেল, তারপর ঘাড় হেঁট করে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো।

গায়ত্রী ঝিল্লীর বাহুবন্ধন থেকে গলা ছাড়িয়ে তার হাত ধরে সোফায় বসল, নিখিলের দিকে চেয়ে হাকিমের মত হুকুম করল—'কি কাণ্ড তোমরা বাধিয়েছ এবার বলো শুনি।'

নিখিল বলল—'আমি কিছু জানি না দিদি, ওই ওকে জিজ্ঞেস করো। ব্যোমকেশদা, চিঠিগুলো কোথায় ?'

ব্যোমকেশ পকেট থেকে চিঠি বের করে দিয়ে বলল—'রাখাল, চল এবার আমাদের যাবার সময় হয়েছে। গায়ত্রী দেবী, চায়ের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নিখিল, তুমি যে বৌ পেলে অনেক ভাগ্যে এমন বৌ পাওয়া যায়। ঝিল্লী, তুমিও কম সৌভাগ্যবতী নও। জীবনে যে-জিনিস সবচেয়ে দুর্লভ, সেই দুর্লভ হাসি তুমি পেলে। তোমাদের জীবনে হাসির ঢেউ খেলতে থাকুক।—এসো রাখাল।'